প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল ধারণা
  মোহাম্মাদ আলী সোমালী
- বন্ধুত্ব গড়ার রীতি ও কৌশল
  সাইয়্যেদ মাহমুদ মারভীয়ান হোসাইনী
- বর্তমান চালচিত্র ও যুব সমাজ
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হওয়ার অকাট্য প্রমাণ
  ড. মোহাম্মাদ মোহাম্মাদ রেযায়ী
- পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে 'উলুল আম্‌র'
  এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর
- ইসলাম এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা
  শহীদ আয়াতুল্লাহ মোর্তাজা মোতাহহারী
- ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.)
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
  আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী
- ওয়াহাবী মতবাদের স্বরূপ
  মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসাইন

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩-৪, অক্টোবর ২০১৪ - মার্চ ২০১৫

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩-৪

অক্টোবর ২০১৪ - মার্চ ২০১৫

সম্পাদক : **এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : আশ্বিন-চৈত্র ১৪২১

জিলহজ ১৪৩৫- জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৬

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : ৩৮/এ, ছিন্নমূল শপিং কমপ্লেক্স

(পরিবর্তিত ঠিকানা) মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 5, No. 3-4, October 2014- March 2015), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও আমাদের করণীয় ৭

- **নীতি-নৈতিকতা**

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল ধারণা ১৫

মোহাম্মাদ আলী সোমালী

বন্ধুত্ব গড়ার রীতি ও কৌশল ৩৪

সাইয়্যেদ মাহমুদ মারভীয়ান হোসাইনী

বর্তমান চালচিত্র ও যুব সমাজ ৫১

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

- **ধর্ম ও দর্শন**

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ৬১

ড. মোহাম্মাদ মোহাম্মাদরেযায়ী

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে 'উলুল আম্‌র' ৬৯

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

ইসলাম এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ৯৪

শহীদ আয়াতুল্লাহ মোর্তাজা মোতাহহারী

- **ব্যক্তিত্ব**

ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.) ১১৩

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

- **বিশেষ নিবন্ধ**

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ ১৩৩

আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী

- **সাম্প্রতিক বিশ্ব**

ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ ১৪৩

মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসাইন

Prottasha
A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 5, No. 3-4, October 2014-March 2015

Table of Contents

- **Editorial**
  Problems of Muslim World and Our Duty **7**
- **Ethics**
  Key Concepts of Islamic Spirituality **15**
  Dr. Mohammad Ali Shomali
  Techniques and Rules of Friendship **34**
  Sayyed Mahmood Marviyan Husseini
  Present Situation and Young Society
  Abdul Quddus Badsha
- **Theology and Philosophy**
  Proves of Being Created of the World in the Eyes of Imam Ali **61**
  Dr. Mohammad Mohammad Rezaei
  Ulul Amr- In the Eyes of the Holy Quran **69**
  A.K.M. Anwarul Kabir
  Islam and Freedom of Thought **94**
  Shaheed Ayatollah Murtaza Mutahhari
- **Personality**
  Imam Ali Ibn Al-Hussain Zainul Abedin **113**
  Compilation: Md. Asifur Rahman
- **Special Article**
  Islam and Nationalism **133**
  Ayatollah Jafar Subhani
- **World Affairs**
  Features of Wahabism **143**
  Mohammad Rezwan Hossain

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :
মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও আমাদের করণীয়

সম্পাদকীয়

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও আমাদের করণীয়

মুসলিম বিশ্ব আজ নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। এ সমস্যাগুলোর পেছনে একদিকে যেমন ইসলামের শত্রুদের হাত রয়েছে তেমনি এর জন্য মুসলমানরা নিজেরাও দায়ী। মুসলমানরা একসময় ইসলামী সভ্যতার জন্ম দিলেও ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তারা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। ভোগবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা, ক্ষমতার দ্বন্দ, শাসকদের অপকর্মের সমর্থক চাটুকার একদল আলেমের উদ্ভব, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ধারক আলেমদের সমাজ বিচ্ছিন্নতা, বিধর্মী ও বিজাতীয় চিন্তার অনুপ্রবেশ,চিন্তাগত ও নৈতিক বিচ্যুতি, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলি, মাজহাবগত সংকীর্ণতা ও গোড়ামি, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র, জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা ইত্যাদি উপাদানগুলো মুসলমানদের ক্রমাগত দুর্বল করে ফেলছিল। ইসলামের শত্রুরা এ দুর্বলতারই সুযোগ নিয়ে মুসলিম বিশ্বের ওপর জেঁকে বসে।

মুসলিম উম্মাহ আজ তিন ধরনের শত্রুর মুখোমুখি। প্রথম দল হল ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র, দ্বিতীয় দল মুনাফিক ও গোপন শত্রু, তৃতীয় দল ধর্মজ্ঞানহীন উগ্র মুসলমানের দল। পবিত্র কোরআন এ তিন দলেরই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। প্রথম দলের মধ্যে মূলত মুশরিক, (হজরত ঈসা ও হজরত মুসার শিক্ষা থেকে বিচ্যুত) খ্রিস্টান ও ইহুদীরা অন্তর্ভুক্ত।খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন : 'ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী (চিন্তা ও কর্মের সমর্থক) হবে।'(বাকারা:১২০)পাশ্চাত্য বিশ্ব যা এ দুই ধর্মের (বিকৃত রূপের) প্রতিনিধিত্ব করে, বিগত চারশ বছর ধরে কখনও প্রকাশ্যে, আবার কখনও গোপনে সমগ্র বিশ্বকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিকভাবে তাদের পদানত করে রেখেছে।মুসলমানরা তাদের সামরিক শক্তির বিপরীতে অসহায়ত্ব বোধ করছে।

অপরদিকে তিনি মুশরিকদের চরিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন:কিভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট (চুক্তি ভঙ্গকারী) মুশরিকদের চুক্তি বলবৎ থাকবে?যেক্ষেত্রে তারা যদি তোমাদের ওপর প্রভাবশালী হয়, তবে তোমাদের সঙ্গে না আত্মীয়তার সম্পর্করক্ষা করবে, আর না চুক্তি ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখবে; তারা তাদের মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করে; কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে; এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য।'(তওবাঃ৮) আরো বলেছেন: 'তারা (মুশরিক) যদি তোমাদের আয়ত্তে আনতে পারে তবে তারা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের হাত ও জিহ্বা দ্বারাতোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং তারা আশা করে যে, তোমরাও অবিশ্বাসী হয়ে যাও।' (মুমতাহিনা:২)

মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতার তীব্রতা ও ধরন সম্পর্কে বলেছেন:(হে রাসূল!) অবশ্যই তুমি লোকদের মধ্যে বিশ্বাসীদের প্রতি সবচেয়ে শত্রুতা পোষণকারী হিসেবে ইহুদী ও মুশরিকদের দেখবে (মায়েদা:৮২)অন্যত্র বলেছেন:হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের নিজেদের (বিশ্বাসীদের) ব্যতীত অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, (কেননা,) তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনে কোনরূপ অবহেলা করে না, তারা কেবল তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ কামনা করে। নিঃসন্দেহে শত্রুতা তাদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের বক্ষসমূহ যা গোপন করে রাখে তা আরও গুরুতর।(আলে ইমরান:১১৮)এ বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামের বর্তমান শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এরাই ঐদল যারা দু'শ বছর মুসলিম বিশ্বের ওপর উপনিবেশবাদের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিল এবং বিগত সত্তর বছর ধরে আমাদের ওপর তাদের তাবেদার শাসকদের বসিয়ে ইসলামী জগতের সম্পদ লুণ্ঠন করছে ও অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যেসাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করছে, বিচ্যুত চিন্তার মুসলমানদের জিহাদের নামে সংঘবদ্ধ করে মুসলমানদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামকে ভীতিকর এক রূপে পরিচিত করানো ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে নিজেদের উপস্থিতিকে বৈধতা দান করছে। আর তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করছে।তারা তাদের আধিপত্য ও দখলদারিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের ধারক সমগ্রতাবাদী ও অধিকার হরণকারী রাজতান্ত্রিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।অপরদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে অবৈধ ইসরাইলী দখলদারীর বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় রত হয়েছে।

দ্বিতীয় দল মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন: '(হে রাসূল!) মানুষের মধ্যে একদল (কপট) আছে যাদের (তোষামোদী) কথাবার্তা পার্থিব জীবনে তোমাকে খুবই বিস্মিত করে এবং সে তার আন্তরিক বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে; অথচ সে (তোমার শত্রুদের মধ্যে) সর্বাধিক শত্রুভাবাপন্ন আর যখন সে ক্ষমতা লাভ করে তখন দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং ফসলাদি ও সৃষ্টিকে (মানুষ ও প্রাণীকে) ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ অরাজকতা পছন্দ করেন না।। (বাকারা:২০৪ ও ২০৫)এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরাই ইসলামের ইতিহাসে জাহেলিয়াতের প্রত্যাবর্তন ঘটায়। যে ইসলাম মানুষের ওপর মানুষের দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে এক আল্লাহর দাস হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষা নিয়ে এসেছিল সে ইসলামকে তারা এক গোত্র ও বংশের দাসে পরিণত করে। জোর করে স্বীয় গোত্রের শাসকদের জন্য মানুষের কাছে বাইয়াত ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণের ধারা চালু করে। বিরোধীদের হত্যা, নিপীড়ন, বন্দী ও নির্বাসন দানই ছিল তাদের রাজনৈতিক কৌশল। তারাই প্রথমবারের মত নৈতিকতাহীন ও ভোগবিলাসী শাসকও যে খলিফা হতে পারে এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে। সামরিক শক্তি, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যাসহ যে কোন কৌশলে ক্ষমতা দখল করা ও তা ধরে রাখাকে বৈধতা দান করে।তারাই অত্যাচারী, অন্যায়কারী ও বিবেকহীন শাসকদেরকেও মুসলমানদের নেতা হিসাবে মেনে নেয়ার আবশ্যকতার মত প্রচার করে।বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর একদল শাসক এ ধারাটিকেই অব্যাহত রেখেছে।এ গোষ্ঠীই মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের পেছনে দায়ী মুসলিম

দেশগুলোরপ্রকাশ্য শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে স্বীয় ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছে।তুর্কী জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, সুন্নী-শিয়া ইত্যাদি বিভক্তির ধোয়া তুলে উম্মতকে তার প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে।

কখনই এরা যায়নবাদী শক্তির দ্বারা জবরদখলকৃত মুসলমানদের ভূমি উদ্ধারের চিন্তা করে না, নির্যাতিত গাজার জনগণের পাশে এদের কখনও দেখা যায় নাকিন্তু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য সহস্র কোটি পেট্রোডলার খরচ করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না।স্বীয় ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মিলিয়ন নিরীহ মুসলমানের রক্ত ঝরানোর প্রয়োজন হলেও তারা তা করে। এ গণভিত্তিহীন শাসকগোষ্ঠী মুসলমান ও যায়নবাদী কাফের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে এনে তাদের আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। যে যুদ্ধ পূর্বে ইসরাইলের সীমান্তে ইহুদী যায়নবাদী ও মুসলিম সেনাদের মধ্যে ছিল সেটিকে সিরিয়া ও ইরাকের রাস্তায় টেনে এনেছে যাতে যায়নবাদীরা নিরাপদ থাকতে পারে। তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তু হয়েছে ও হাজার হাজার মুসলমান প্রাণ হারাচ্ছে। যে ইসরাইল হামাস ও হিজবুল্লাহর দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এ মুনাফিকদের কারণে যায়নবাদীরা পুনরায় গাজায় ৫০দিনব্যাপী বর্বর হামলা করার সাহস পেয়েছিল।

মুনাফিকদের এ দলটির মুখপাত্র বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি ইসরাইল থেকে ফিরিয়ে ইসলামের মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা ইসলামের শত্রুদের মূল লক্ষ্য। সউদী আরবের 'আর রিয়াদ' পত্রিকার এক সংখ্যায় বলা হয়েছে: 'ইরাক ও সিরিয়া ব্যতীত 'জিসিসি'ভুক্ত দেশগুলোকে ইরানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এক প্রতিরক্ষা জোট তৈরী করতে হবে। আমাদের বায়তুল আকসা মুক্তকরণ, ফিলিস্তিন জাতির মুক্তি ও এর ভূখণ্ড উদ্ধার এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে ইরানকে টার্গেট করতে হবে। কারণ আমাদের আসল শত্রু ইসরাইল নয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।' এ প্রতিক্রিয়াশীল মুনাফিকগোষ্ঠী যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সহযোগিতায় তুর্কী খেলাফতের পতন ঘটিয়ে ও ইসলামী বিশ্বকে শতধা বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতায় বসেছে এবং পাশ্চাত্যের করুণায় টিকে আছে, তাদেরকাছে পাশ্চাত্যের প্রভুদের সন্তুষ্টিই মূখ্য হবে এটাই স্বাভাবিক।যারা মুসলমানদের রক্তের ওপর নিজেদের প্রাসাদ গড়েছে, তাদের কাছে ফিলিস্তিনীদের রক্তের মূল্যই বাকতটুকু? ফিলিস্তিন নামে যদি পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র নাও থাকে ও একজন ফিলিস্তিনিও যদি জীবিত না থাকে এই মুনাফিকদের কিছু যায় আসে না। ইসরাইলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ১৯৮৬ সালের জুনে সাদ্দাম ইরানীদের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে, যদি এ বছর 'আল কুদস' দিবসের মিছিল বের করা হয় তবেসমগ্র ইরানে ঐ মিছিলের ওপর সে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করার নির্দেশ দিবে।যদি মুসলমানরা আজ ঐক্যবদ্ধ থাকতো এবং বনি উমাইয়ার বশংবদ এ রাজতান্ত্রিক শাসকরা বিশ্বাসঘাতকতা না করতো তবে নিঃসন্দেহে সহস্র মানবতাবিরোধী অপরাধের হোতা ইসরাইলের পতন ঘটতো।

তৃতীয় যে দলটি নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞতাবশত মুলমানদের সাথে শত্রুতা করছে তারা হল খারেজী চিন্তার ধারকরা যারা নিজেদের ছাড়া সকলকে কাফের বলে অভিহিত করে। এ গোষ্ঠী কাফের ও মুশরিকদের বিষয়ে নাজিলকৃত আয়াতকে মুমিনদের ওপর আরোপ করতো (সহীহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ.৫১, কিতাবু ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দিন)তারাআহলে কিবলা ও মুসলমানদের রক্ত ঝরাতো ও সম্পদকে লুণ্ঠন করতো। (তাফসীরে বাগাভী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫৭; তাফসীরে সালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ.২৭১) মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ হবে; তখন একদল থাকবে যাদের কথা আকর্ষণীয় ও কর্ম খুবই মন্দ হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলদেশের নীচে নামবে না (এর মর্মকে অনুধাবন করবে না), তীর যেমন ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে... তারা কোরআনের দিকে আহ্বান করবে অথচ তার থেকে কিছুই তারা অর্জন করেনি। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো মাথা মুণ্ডন করা।' (মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪; সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮, হা. ৪৮৬৫, মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৫ম খণ্ড, পৃ.৪২৬) তারা কেবল মুসলমানদের সাথেই যুদ্ধ করতো এবং কখনই মুশরিক ও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতো না (সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ.৮৯; শারহে সহীহ মুসলিম, নাভাবী, ৭ম খণ্ড, পৃ.১৫৯, উমদাতুল কারী, ১৫তম খণ্ড, পৃ.২৩১)

এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত ও মুসলমানদের কাফের প্রতিপন্নকারী গোষ্ঠীর ওপর একশভাগ প্রযোজ্য।তারা নিরীহ মুসলমানদের এমনকি নারী ও শিশুদের হত্যা করে থাকে। অথচ আল্লাহ কোন মুসলমানকে কাফের বলতে নিষেধ ওঅন্যায়ভাবে যে কোন মুমিনকে হত্যার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। (নিসা: ৯৩ ও ৯৪) আজ ধর্মজ্ঞানহীন এ দলটি পাশ্চাত্যের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ও পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় যায়নবাদী ইসরাইলের প্রতিপক্ষ ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ও ইসলামের শত্রুদের স্বার্থকে নিশ্চিত করছে। এরা নাইজেরিয়া, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি মুসলিম দেশের পথে-ঘাটে, বাজারে, মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং নিরীহ মুসমানদের শুধু এ অজুহাতে যে তাদের মতাবলম্বী নয় হত্যা ও শিরোশ্ছেদ করছে। অথচ যখন ফিলিস্তিনের নারী ও শিশুরা আর্তনাদ করে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছে তখন নিরবতা পালন করছে।

শুধু তাই নয় এরা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে আগত ইসলামের এক বীভৎস চিত্র পৃথিবীর সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করছে। যে ইসলাম এর মহানুভব আদর্শের কারণে মানুষের মন জয় করেছিল। মহানবী (সা.) তাঁর চাচা হামজার কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দা ও ইসলামের চরম শত্রু আবুসুফিয়ানসহ অন্যান্য মুশরিকদের ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে ইসলামের উদারতার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন সে ইসলাম আজ এমন এক নৃশংসরূপে পরিচিত হচ্ছে যা স্বীয় মুসলমান ভাইদের এমনকি নারী, শিশু ওবন্দীদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদের দাস হিসেবে বিক্রয় করে। অথচ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।'(নিসা:২৯)কারবালায়

শিশু ও নারী হন্তা বনি উমাইয়ার ইসলাম এ গোষ্ঠীর বর্বরতার মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। আর ইসলামের শিক্ষার সাথে অপরিচিত একদল মুসলমান যুবক মানবতাবর্জিত এ বিকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের রক্ত ও শ্রম দিচ্ছে। যে রক্ত ও শ্রম ইসলামের স্বার্থে ও এর শত্রুদের ধ্বংসে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক ছিল, এখন তা নিজেদের শক্তি ক্ষয় ও প্রজন্মের বিনাশে ব্যয় হচ্ছে। যে যুবকটি ইসলামের জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সামরিক শক্তিকে মজবুত করতে পারতো সে ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে পা দিয়ে ইসলামের পক্ষ শক্তিকে দুর্বল ও এর বিরোধী শক্তিকে মুসলমানদের ওপর আধিপত্য দানে ভূমিকা পালন করছে।

আল্লাহ এ দিকটির প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: '(হে বিশ্বাসিগণ!) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আর পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাবশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর ধৈর্য্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (আনফাল:৪৬) তিনি তাঁর রাসূলকে কেবল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হওয়ারই নির্দেশ দেননি বরং যারা তাঁর অবাধ্য হয় তাদের প্রতিও কঠোরতা দেখানো থেকে বিরত থাকাকেই উত্তম জ্ঞান করেছে। (শোয়ারা:২১৫-২১৬ ও আলে ইমরান:১৫৯)এটা এ কারণে যে, যেন মুসলমানরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকে। মহানবী (সা.) এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মত মুনাফিকদেরও শাস্তি দান থেকে বিরত থাকতেন যাতে তার অনুসারীদের মধ্যে এ ঐক্য বজায় থাকে।পবিত্র কোরআন আমাদের শত্রুর প্রতিও সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলছে: মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দিয়ে, ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। (হা-মীম আস সাজদাহ:৩৩) সেক্ষেত্রে মুমিনদের প্রতি আমাদের কতটা সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ মুসলমানদের পরস্পরের ভাই বলে অভিহিত করেছেন (হুজুরাত:১০) এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু হওয়াকে মহানবী (সা.) এর প্রকৃত সঙ্গীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন (ফাতহ : ২৯) এ বৈশিষ্ট্যগুলো মুসলমানদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা আবশ্যক। নতুন প্রজন্মকে তাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা দানে মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অবদান ও ইউরোপীয় সভ্যতাকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বের করে আনতে ইসলামী সভ্যতার ভূমিকার কথা স্মরণ করাতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে শত্রুদের অহেতুক ভয় দূর করতে হবে। কারণ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন :তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন কর না এবং দুঃখিতহও না, (কেননা,) যদি তোমরা খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে থাক তবে তোমরাই শ্রেষ্ঠ (ও জয়ী) হবে। (আলে ইমরান : ১৩৯) আমাদেরমনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা একতাবদ্ধ ছিল বলেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল (ফিরকা), জাতি ও মাজহাব থাকা সত্ত্বেও তারা মহান এক সভ্যতার জন্ম দিতে পেরেছিল এবং এ ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক জাতি ও বর্ণ

সাধ্যমত তার মেধা ও যোগ্যতাকে এ পথে ব্যয় করতে পেরেছিল। বৈচিত্র সত্ত্বেও তারা নিজেদের এক জাতি ও সত্তা বলে জানতো।

আমাদের অবশ্যই পাশ্চাত্যের দোসর স্বৈরাচারী শাসকদের চিনতে হবে এবং তাদের শোষণ ও জুলুম সম্পর্কে মুসলমানদের অবগত করতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের প্রকৃত চেহারা যুবকদের সামনে উন্মোচিত করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও আত্মঘাতি দ্বন্দের তাদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে। ইসলামের আনীত প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য ও সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করাতে হবে। জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিতকারী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রূপ ও কাঠামোকে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের, যা মূলত সংখ্যালঘু পুজিবাদী গোষ্ঠীর শাসন,প্রতারণার শিকার না হয়। পাশ্চাত্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরোধী বিভিন্ন দল ও চিন্তার অনুসারীদের সঙ্গে সংলাপ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও আল আকসা মুক্তির আন্দোলনে যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে প্রতিরোধ আন্দোলনের সফলতার খবর প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের আশাকে জাগ্রত করতে হবে।অপরিণামদর্শী ও অদূরদর্শী তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল যে কোন দল সম্পর্কে জানতে পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমের ওপর আদৌ নির্ভর না করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর এ নির্দেশকে স্মরণ রাখা :হে বিশ্বাসিগণ! যদি (আল্লাহর) অবাধ্য (ও পাপাচারী) কোন ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বস এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে হয়। (হুজুরাত:৬) আর ইসলামের নামে সংঘটিত যে কোন বর্বর ও মানবতা বিরোধী কর্মের সাথে ইসলামের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া যেন মহান ইসলামের ওপর কলঙ্কের ছাপ না পড়ে। উগ্র ও গোড়া চিন্তার সকল দলকে যে কোন ফিরকা ও মাজহাবের অনুসারীই হোক বর্জন করতে হবে। বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে চিন্তাগত মতবিনিময় ও সংলাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। একে অপরের ওপর অপবাদ ও মিথ্যা আরোপ থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিশেষে মহানবী (সা.) এর মহান চরিত্র ও জীবনপদ্ধতিরসাথে পরিচিত ও ইসলামের জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিভিন্ন মাজহাবের আলেমদের গ্রন্থ থেকে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে।

নীতি-নৈতিকতা

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল ধারণা

বন্ধুত্ব গড়ার রীতি ও কৌশল

বর্তমান চালচিত্র ও যুব সমাজ

ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় মূল ধারণা : ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও বিনয়

মোহাম্মদ আলী সোমালী

ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং বিনয় হলো তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথবা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই প্রবন্ধে এগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এই তিনটি বিষয় বেছে নেয়ার কারণ শুধু এজন্য নয় যে, এগুলো তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ; বরং এগুরো বাস্তবিক প্রতিদানপূর্ণ। যদি আমরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে চাই তাহলে আমরা তা সহজেই করতে পারি। আমাদের জীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে।

ভালোবাসা

ইসলামী হাদীস অনুযায়ী যা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিও সমর্থন করে তা হলো বিশ্বাস রাখা বা বিশ্বাসের ঘাটতির পুরো কারণের ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে যা কিছু সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ আমরা হাদীসে পড়ে থাকি– একদা মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন : ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল কি?' সাহাবীরা একেক জন একেক উত্তর দিলেন। কেউ বললেন, নামায, কেউ বললেন, রোযা, কেউ বললেন যাকাত। তাঁরা এসব উত্তর দেওয়ার পর বললেন যে, আল্লাহ ও মহানবী (সা.) এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত। তাই মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন : আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই অপছন্দ বা ঘৃণা করা।'

আমরা এটা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, একজন বিশ্বাসী ও একজন অবিশ্বাসীর মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? কতিপয় সত্য জানাটাই কি যথেষ্ট নয়? ইবলীস সেই সকল সত্য

জানত, কিন্তু সে এখনও অবাধ্য বলে বিবেচিত। আল্লাহ কোরআনে বলেন যে, এমন মানুষ রয়েছে যারা সবকিছু জানে, কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করে না :

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

'তারা অন্যায় (ভাবে) ও আত্মগরিমাবশত এগুলো অস্বীকার করেছিল, যদিও তাদের অন্তরে সেটার (সত্যতার প্রতি) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; অতঃপর লক্ষ্য কর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল?-সূরা নামল : ১৪

একইভাবে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য কেবল সকল সত্যকে ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়, যেমন মুনাফিকরা হরহামেশাই সত্যের ঘোষণা দেয়। এমন লোকদের বর্ণনায় কোরআন বলে :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা (মুখে) বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, অথচ তারা (আন্তরিকভাবে) বিশ্বাসী নয়।-সূরা বাকারা : ৮

সত্যের প্রতি ভালোবাসা হলো একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যকার প্রধান পার্থক্য। ভালোবাসার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান এবং ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি। সত্য ঘোষণা দেওয়ার এই প্রস্তুতি এসব পরিস্থিতিকে শামিল করে না যেখানে একজন মানুষের তাকিয়া করা আবশ্যক অথবা একজনের বিশ্বাসকে লুকানো তার নিজের জীবনের নিরাপত্তা অথবা অন্য বিশ্বাসীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।

একজন বিস্মিত হতে পারে যে, কেন ইসলাম আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা উভয়টির ওপর আলোকপাত করে? একজন ঘৃণা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে এবং বলতে পারে, আমাদের অন্তরে কেবল ভালোবাসা থাকা উচিত। যাহোক, ইসলাম একটি যুক্তিভিত্তিক ধর্ম এবং এটি যুক্তি দ্বারা বোধগম্য যে, যখন আমরা কোন কিছুকে ভালোবাসি তখন আমরা অবশ্যই তার বিপরীতটিকে ঘৃণা করি। কিভাবে আমরা সৎ ব্যক্তিকে ভালোবাসতে পারি অসৎ ব্যক্তিকে ঘৃণা করা ছাড়া? অথবা মিথ্যাকে ঘৃণা করা ছাড়া সত্যকে কিভাবে ভালোবাসা যায়? যদি আপনি

পুণ্যকে ভালোবাসেন তাহলে পাপকে ঘৃণা করা ছাড়া আপনার আর কোন পথ নেই। একইভাবে আপনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসেন তাহলে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর শত্রুকে ঘৃণা করবেন। নিশ্চয়ই একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কারো প্রতি ব্যক্তিগত অপছন্দ থাকা উচিত নয়। যদি আপনি কাউকে ঘৃণা করেন তাহলে তা তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের কারণে। আমরা কাউকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভালোবাসতে পারি, কিন্তু আমরা তার মধ্যকার খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভালোবাসতে পারি না। এটি হলো ভালো বিষয়কে ভালোবাসার যৌক্তিক সংশ্লিষ্টতা।

এমনকি যদি এ দুটি ধারণাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে এদের অবস্থান একই মুদ্রার দুটি দিকের মতো। যদি আমরা নিজেদের উন্নত করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি এবং যাঁরা তাঁর নিকটবর্তী তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং যেসব কাজকে আল্লাহ ভালোবাসেন সেসব কাজের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করা। এটি অর্জিত হতে পারে অধিক জ্ঞান অর্জন এবং তারপর সেটির প্রতিফলন ঘটানো দ্বারা।

আমাদের নিজেদের উন্নত করার জন্য একটি চমৎকার ও বাস্তব পথ হলো যাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সাথে একটি নৈকট্যের সম্পর্ক উন্নয়ন করেছিলেন তাঁদের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। তাঁদের জীবনপদ্ধতি তাঁদের জীবন সম্পর্কে অনেক গোপন-রহস্যের বিষয় প্রকাশ করে যা আমাদেরকে তাঁদের জীবন পদ্ধতি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে সাহায্য ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এটি একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া।

কোন ব্যক্তি যে জ্ঞানই অর্জন করে তার সাথে অনুধ্যানের যুগলবন্দি হওয়া উচিত যাতে সেই জ্ঞানের অনুশীলন করা যায়। অনুধ্যান একজনের সত্তায় ঐকতান নিয়ে আসে যেন একজনের ভাবাবেগ তার জ্ঞানকে সমর্থন করতে শুরু করে। যেমন যদি আমরা জানি যে, মিথ্যা বলা সঠিক নয়, তারপরও আমি মিথ্যা বলতে পারি। প্রতিদিন আমার কয়েক মিনিট সময়ের প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা যে, কেন মিথ্যা বলা ভুল এবং অনুধাবন করতে হবে যে, এটি কোন উপকার বয়ে আনে না।

আমরা যাদেরকে ভালোবাসি যদি তাদের প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন আমরা এসব লোককে ভালোবাসি। যদি কেউ আপনাকে চাকরি দেয় বা জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আপনি যতদিন জীবিত আছেন ততদিন

তাকে ভোলা উচিত নয়, যদি কেউ আপনাকে কিছু শিক্ষা দেয় তাহলে আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যদি কেউ আপনাকে সাহায্য করে অথবা অর্থ দেয় অথবা আপনার প্রতিবেশী আপনার প্রতি স্মিত হাস্য দেয় অথবা আপনার প্রতি সদয় হয়, তাহলে তাদেরকে আপনার ভালোবাসা উচিত। মানুষকে ভালোবাসার জন্য বড় কোন কারণের দরকার নেই; কেবল একটু যত্ন নেয়া এবং ভালোবাসাই যথেষ্ট। তাহলে কী করে আমরা আল্লাহকে ভালো না বেসে থাকতে পারি যখন আমাদের যা কিছু সবই তাঁর থেকে এবং তাঁর থেকে কোন মন্দ নেই। আমরা এসব জানি, কিন্তু আমাদের কেবল এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যদি আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং গভীরতর হয় তাহলে আমরা আল্লাহকে অমান্য করতে পারব না। কিভাবে আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে অমান্য করতে পারেন এবং তাকে অসন্তুষ্ট করতে পারেন?

তাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা আমাদেরকে বাস্তবে আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করতে পারে এবং আমরা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা এমন একটি পুণ্যের বিষয় যা ভীষণভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসর সাথে জড়িত। যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন। তাঁর সামান্য রহমতের বা নেয়ামতের কারণে এবং যদিগ আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন তাহলে আপনি তাঁকে বিশ্বাস করবেন এবং আনুগত্য করবেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ঈমানের মূল (কোর)। এটা কাকতালীয় নয় যে, আরবিতে অকৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে টার্ম ব্যবহার করা হয় তা হলো কুফ্‌র। নিচে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো যেখানে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে :

إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧

যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আল্লাহ তোমাদের হতে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তিনি অবশ্যই তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করবে না; অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই। তখন তিনি তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি বক্ষস্থলে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। সূরা যুমার : ৭ (৩৯: ৭)

قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٞ ٤٠

এক ব্যক্তি যার নিকট গ্রন্থের কিছু জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আপনি আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট এনে দেব।' অতঃপর সুলাইমান যখন তা নিজের সম্মুখে রক্ষিত দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ (থাকি), না অকৃতজ্ঞ (হই)। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার কল্যাণের জন্যই করে, আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (সে স্মরণ রাখুক যে,) আমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, মহামহিম।' সূরা নামল : ৪০ (২৭: ৪০)

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا لُقۡمَٰنَ ٱلۡحِكۡمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِۚ وَمَن يَشۡكُرۡ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ١٢

নিঃসন্দেহে আমরা লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের (কল্যাণের) জন্যই তা করে; আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, (তার জানা উচিত যে,) নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, অতীব প্রশংসিত।' সূরা লুকমান : ১২ (৩১ : ১২)

সূরা ইনসান এর মধ্যে খুবই লক্ষণীয় একটি আয়াত পাওয়া যায় যেখানে কৃতজ্ঞতাকে বিশ্বাসের সমার্থক বলা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতাকে এর বিপরীত :

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মিশ্রিত শুক্র-বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; অতঃপর আমরা তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন করেছি। নিশ্চয় আমরা তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। সূরা ইনসান : ২-৩ (৭৬ : ২-৩)

অতএব, শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (কনসেপ্ট)। এটি ঈমানের মূলের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক বিষয়। এটি বাস্তব এবং জটিলতাহীন। উপরন্তু যদি আমরা কৃতজ্ঞ হই, তাহলে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারব– পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছেন–

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

স্মরণ কর, যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ফিরআউনের লোকদের থেকে উদ্ধার করেছিলেন যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদের জবাই করত এবং নারীদের

(কন্যাসন্তানদের দাসী হিসাবে) জীবিত রাখত এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মহাপরীক্ষা ছিল।' (৭) (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞ হও, তবে আমরা তোমাদের নিয়ামতে আধিক্য[১] দান করব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি অতি কঠোর।' সূরা ইবরাহীম : ৬-৭ (১৪:৬-৭)

একজন শিক্ষকের কথা চিন্তা করুন যাঁর একজন কৃতজ্ঞ ছাত্র আছে। সেই ছাত্র তার শিক্ষককে ধন্যবাদ দেয় এবং জানে যে, শিক্ষক তাকে সাহায্য করার একটি ভালো কাজ সম্পাদন করছে। অধিকন্তু ছাত্রটি ঘোষণা করে যে, সে কৃতজ্ঞ এবং তারপর তার শিক্ষক তাকে যা শিক্ষা দেন সে তা বাস্তবে অনুশীলন করে। শিক্ষকটি যা জানেন তা এই ছাত্রকে শিখাতে পছন্দ করেন যেহেতু শিক্ষক এটা অনুধাবন করবেন না যে, তাঁর জ্ঞান কোন কাজে লাগছে না বা অপচয় হচ্ছে না।

এটি হচ্ছে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার উদাহরণ যে তার হৃদয় দিয়ে সাধুবাদ জানায়, তার জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা করে এবং তার শরীর দ্বারা অনুশীলন করে। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে অধিক অধিক দেবেন এবং তার কোন সীমা নেই। তিনি যত অধিক দেবেন আপনি তত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করবেন। দোয়ায়ে ইফতিতায় আমরা পড়ি : 'হে ঐ সত্তা! দানের প্রাচুর্য যার মহানুভবতা এবং দানের ক্ষেত্রে তাকে বাধাগ্রস্ত করে না।'

কেউ হয়তো বিস্মিত হতে পারে যে, আল্লাহর দানশীলতা দোয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। যখন আল্লাহ আপনাকে কিছু দেন এবং আপনি কৃতজ্ঞ হন এবং এ অবস্থাকে ধরে রাখেন, তখন আপনার গ্রহণ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ঐশী দানের ক্ষেত্রে কোন সীমা নেই কেবল আমাদের গ্রহণ করার সীমিত সক্ষমতা ছাড়া। আল্লাহ যত দেন, আমাদের তত সক্ষমতা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং তার মহানুভবতা এই অসীম ক্ষমা

[১] এ কারণে এক হাদিসে এসেছে, যদি তুমি ইসলামের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে ঈমানের নিয়ামত পাবে। আর যদি ঈমানের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হও, তবে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে এবং যদি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের নিয়ামতে কৃতজ্ঞ হও, তবে তাঁর নৈকট্যের স্থলে পৌঁছবে।

কৃতজ্ঞতার ধারণা অনেক মুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছে– যাঁরা কৃতজ্ঞতার নানা প্রকারের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখিয়েছেন। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী তাঁর 'মানাযিল আস সায়েরীন' (আধ্যাত্মিক সফরকারীদের মঞ্জিলসমূহ) গ্রন্থে কৃতজ্ঞতার তিনটি প্রধান ধরনের উল্লেখ করেছেন :

- **অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা :** এটা জানা যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার।
- **কথার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা :** এটা ঘোষণা করা যে, ঐশী অনুগ্রহের জন্য আপনি কৃতজ্ঞ।
- **অনুশীলনে কৃতজ্ঞতা :** ইবাদতের জন্য আপনার হাত, পা, চোখ ইত্যাদি দ্বারা কিছু করা। এটি বাস্তব কৃতজ্ঞতা।

প্রথম ধরনের কৃতজ্ঞতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটি অপর দুটিকে আনে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কৃতজ্ঞতা তিনটি প্রধান বিষয়কে ধারণ করে :

- কোন জিনিসকে উপহার বলে জানা– যেমন কেউ স্বাস্থ্য বিষয়ে সবকিছু জানতে পারে, কিন্তু এটা জানা যে, স্বাস্থ্য হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপহার– এটা হলো অতিরিক্ত কিছু জানা।
- স্বীকার করা যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপহার : এর অর্থ হলো এটা স্বীকার করা যে, যা একজনকে দেয়া হয়েছে সেটি হলো উপহার এবং সে হলো গ্রহীতা। কখনো কখনো কেউ জানতে পারে যে, কোন কিছু উপহার, কিন্তু সে অহংকার বশে তার মেনে নিতে অস্বীকার করে।
- এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা।

পরিশেষে, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী কৃতজ্ঞতার ধারণা অধ্যয়ন করেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, কৃতজ্ঞ হওয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে–

- কোন কোন পর্যায় বা স্তর সাধারণ মানুষের : তারা বোঝে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু উপহার রয়েছে যে জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সন্তুষ্ট হতে চেষ্টা করি এবং তাঁর প্রশংসা করি।
- উচ্চতর স্তরে মানুষ আল্লাহ তাদেরকে যে উপহার দিয়েছেন তার জন্য কেবল কৃতজ্ঞই হয় নয়; বরং যা কিছু তাদের ক্ষেত্রে ঘটে সেটার জন্যও কৃতজ্ঞ হয়।

এমনটি কোন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে যদি কোন খারাপ ঘটনা ঘটে– আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার ঘাটতির কারণে নয় এবং তাই একজন মুমিন সেটার জন্যও কৃতজ্ঞ।

- কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে ভীষণভাবে সচেতন : তারা কোন আনন্দ- বেদনা অনুভব করে না যেহেতু তারা আনন্দে আছে নাকি বেদনার মধ্যে আছে তা নিয়ে চিন্তা করার মতো কোন সময় তাদের নেই। এটাই হলো ভালোবাসার শক্তি। একইভাবে যদি আপনি কোন আকর্ষণীয়, চমকপ্রদ চলচ্চিত্র উপভোগ করতে থাকেন, তাহলে আপনি ভুলে যান যে, আপনি ক্ষুধার্ত। অথবা যদি আমরা এমন কোন ব্যক্তির সান্নিধ্যে অবস্থান করি যাকে খুব ভালোবাসি, তাহলে আমরা সময়ের কথা ভুলে যাই এবং চাই না যে, এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটুক। আল্লাহকে যেসব লোক এভাবে ভালোবাসে তারা সম্পূর্ণভাবে তাতে লীন হয়ে যান। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী এটাকে সম্ভ্রান্তদের (এলিট) কৃতজ্ঞতা বলেছেন।

ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা দুটি পরস্পরগ্রন্থিত ধারণা বা বিষয় যা আমাদের আত্ম উন্নয়নের পথে আমাদেরকে বাস্তবিকভাবে সাহায্য করতে পারে। ইমাম খোমেইনী (রহ.) তাঁর 'চল্লিশ হাদীসৎ গ্রন্থে এটি নির্দেশ করেছেন যে, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রভাব হৃদয়ে, কথায় এবং শারীরিক কর্মকাণ্ডে ও নাড়াচড়ায় স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। হৃদয়ের ক্ষেত্রে একজন নম্রতা, ভদ্র ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়। কথার ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো হলো কেবল আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা। দেহের ক্ষেত্রে আনুগত্যের মাধ্যমে এবং আল্লাহর জন্য নিজের দেহকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে প্রভাব বোঝা যায়।

বিনয়

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার ধারণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হলেঅ পরম বিনম্রতা বা আধ্যাত্মিক দারিদ্র। এর অর্থ হলো আল্লাহর মুখাপেক্ষিতার বুঝকে শক্তিশালী করা এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতার ধারণা অর্জন করা। এর অর্থ হলো 'আল্লাহ আমার প্রতি ভীষণ দয়ালু' অথবা 'আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহশীল' এটা বলাই যথেষ্ট নয়।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত ছাড়া আমরা কিছুই নই। এটি এমন নয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাধীন কোন বিষয়ের প্রতি অনুগ্রহশীল। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া আমরা কিছুই নই। সকল ভালো বিষয় তাঁর থেকে আসে; আর সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যকল্প হলো আমরা কেবলই গ্রহীতা, আল্লাহর মুখাপেক্ষি একটি সৃষ্টি, কোনভাবেই তাঁর থেকে স্বাধীন কোন সত্তা নই।

কেউ কেউ এটাকে নম্রতার সাথে তুলনা করতে পারে, কিন্তু এটি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, অধিক গভীরতাসম্পন্ন এবং উঁচু স্তরের। কখনো কখনো মানুষ বিনম্র হওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করে। যেমন তারা যদি এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাহলে এর কারণে যে, তারা সফলতা লাভ করেছে, তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যাতে তারা উদ্ধত না হয়; এটি একটি সংগ্রাম। কিন্তু যদি কেউ আধ্যাত্মিক দারিদ্রতা অর্জন করে তাহলে সেখানে সংগ্রামের বা চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, যেহেতু সে অনুভব করে যে, অহংকারী বা উদ্ধত হওয়ার মতো তার নিজের কিছুই নেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া উপহার ছাড়া। আমাদের সীমাবদ্ধতা এবং নিরঙ্কুশ মুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতার বিষয় চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের উদ্ধত ও আত্মসম্মানের কোন স্থান নেই। আমাদের যা কিছু আছে অথবা আমাদের অধিকারে আছে তা আল্লাহর। আমাদেরকে আমানত হিসাবে সবকিছু দেয়া হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এবং কিয়ামতের দিন আমরা কিভাবে তা ব্যবহার করেছি তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। নিশ্চয়ই আমাদের অস্তিত্বের সবকিছুই আল্লাহর।

রেনে গুনোন লেখেন : 'মুখাপেক্ষি সত্তা এভাবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে : যা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, নিজের মধ্যে অস্তিত্বের বিষয়টি ধারণ করে না, এর দৃষ্টান্ত এমন যে, এমন সত্তা নিজে কিছুই না এবং সে কিছুরই অধিকারী নয়, যা তাকে গঠন করে। একই ঘটনা মানুষের ক্ষেত্রেও যতক্ষণ পর্যন্ড় সে একটি স্বতন্ত্র, যেটা সকল প্রকাশিত বস্তুর মতো, যে কোন অবস্থার জন্যই হোক না কেন, সর্বজনীন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যত বড় পার্থক্যই থাকুক না কেন, এটি সবসময় কিছুই না সেই নীতির সূত্র অনুযায়ী। এইসব সৃষ্টি, মানুষ অথবা অন্যান্য, তাই যাই হোক না কেন সম্পূর্ণ একটি নির্ভরশীল অবস্থায় রয়েছে এই নীতি অনুযায়ী যা থেকে পৃথক হলে সেখানে কিছুই নেই, নিরঙ্কুশ অনস্তিত্ব। এটাই এই নির্ভরশীলতার চেতনা যেটাকে কতিপয় হাদীসে 'আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য' বলা হয়েছে।

একই সময়ে যে ব্যক্তি এই চেতনা অর্জন করেছে তার জন্য, এর আছে, এর তাৎক্ষণিক ফল হিসাবে, সকল প্রকাশিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতা, যে ব্যক্তি এর পর থেকে জানে যে, এই বস্তুসমূহ তার মতোই কিছুই নয়, এবং সেগুলোর নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের তুলনায় কোনভাবেই সেগুলোর কোন গুরুত্ব নেই।[১]

ইমাম হোসাইন (আ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন : 'যখন আমি তোমার কাছে আসতে চাই তখন আমি কী আনতে পারি? আমি কি আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহ্বা, আমার হাত ও আমার পা নিয়ে আসতে পারি? বিষয়টি কি এমন নয় যে, সবকিছুই তোমার দান যা তুমি আমাকে দিয়েছ?[২]

অন্যত্র ইমাম হোসাইন বলেন : 'হে আমার প্রভু! আমি আমার ধনবান অবস্থায় দরিদ্র, তাহলে আমি আমার দরিদ্রাবস্থায় দরিদ্র হব না কিভাবে?'[৩]

যা কিছু আমার আছে সেগুলো আমার প্রয়োজনের নিদর্শন, আমার নির্ভরশীলতার নিদর্শন। আমার যা নেই তা ব্যাপারটি কি? ধরুন এক ব্যক্তি একটি ব্যাংক থেকে অর্থ ঋণ নিয়েছে– এক মিলিয়ন ডলার এবং আরেক ব্যক্তি এক হাজার ডলার। কোন ব্যক্তি অধিক ধনী আর কোন ব্যক্তি নয়? এটা অবশ্যই জানব যে, যে ব্যক্তি অধিক অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছে সে অধিক ঋণী এবং অধিক দায়ী এবং তার এ ব্যাপারে চিন্তাও বেশি। আল্লাহ আমাদের যা দেন তার মাধ্যমে আমাদেরকে অধিক পরিমাণে ঋণী করেন। প্রচুর সংখ্যক জিনিস রয়েছে যা আমাদের নেই এবং এমনকি আমাদের কাছে যা আছে তা আমাদের নয়, তাহলে কিভাবে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি এবং প্রয়োজন থেকে মুক্ত থাকতে পারি?

ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন : 'আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমি অজ্ঞ, তাহলে আমি যা জানি না সেদিক থেকে কিভাবে আমি অধিকতর অজ্ঞ নই?'[৪]

আমরা যা জানি তা খুবই সীমিত এবং তা অনেক প্রশ্ন দ্বারা ঘেরা। আমরা যত বেশি জানি, আমাদের তত প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। এ কারণেই যাঁরা অধিক জ্ঞানী তাঁরা তাঁদের দাবিতে তত বেশি সচেতন ও সতর্ক এবং অহমিকা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। তারপরও কালক্রমে আমরা যা জানি তা সহজেই হারিয়ে ফেলি। এমনকি অনেক মানুষ তাদের নিজেদের নিকটাত্মীয়দের নামগুলোও মনে রাখতে পারে না। ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তোমার বিষয়াদির পরিবর্তন

এবং তোমার নির্দেশের উন্নতির গতি তোমার সেই সকল বান্দাকে প্রতিরোধ করে যারা তোমাকে জানে আস্থাশীল যখন তারা তোমার অনুগ্রহ উপভোগ করে অথবা হতাশ হয় যখন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে।[৫]

এই বিশ্বের সবকিছুই দ্রুত পরিবর্তিত হয়। কখনো কখনো আমরা আনন্দিত, আবার কখনো ব্যথিত। কখনো মানুষ আমাদের সম্মান করে, আবার কখনো কেউ আমাদের সম্মান করে না। কখনো আমাদের সন্তান-সন্ততি আমাদের প্রতি ভালো আবার কখনো নয়। সেখানে অনেক উত্থান-পতন রয়েছে। এর কারণ কী? আমাদের জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা কোন কিছুকেই বিশ্বাস করতে পারি না। কেউ জানে না যে, কী ঘটবে, আর তাই আমাদের কিছুকেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। যেমন ইমাম হোসাইন (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, আমাদের আল্লাহ ছাড়া কোন কিছু বা কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং একই সাথে আমাদের হতাশ হওয়াও উচিত নয়। যখন খারাপ কিছু ঘটে তখন আমাদের আশাহত হওয়া অথবা অসহায় বোধ করা উচিত নয়। আল্লাহর হাতেই চাবিকাঠি এবং তিনি আমাদের অবস্থাকে যে কোন মুহূর্তে উত্তম অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন। এগুলো উল্লেখ করে ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন : আমি তোমার কাছে আমার দারিদ্র্য ও তোমার মুখাপেক্ষিতা নিয়ে প্রার্থনা করি। কিভাবে আমি তোমার কাছে এমন কিছু নিয়ে প্রার্থনা করতে পারি যা তোমাতে পৌঁছাতে সম্ভব নয়। অথবা কিভাবে আমি তোমার কাছে আমার অভিযোগ জানাতে পারি যখন তা তোমার কাছে গোপন নয়? হে আমার আল্লাহ! কিভাবে আমি দরিদ্র হব না যখন তুমি আমাকে দরিদ্রদের মাঝে স্থান দিয়েছ? এবং কিভাবে আমি দরিদ্র হতে পারি যখন তুমি আমাকে তোমার মহানুভবতা দ্বারা আমাকে ধনী করেছ?'[৬]

এটা দেখায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ইমাম যে মাধ্যম বা উসিলা দিয়েছেন তা হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা এবং তাঁর গভীর অনুধাবন যে, তিনি হলেন দরিদ্র এবং আল্লাহর তাআলার সামনে কিছুই নন। অতঃপর ইমাম হোসাইন যে উসিলা খুঁজে পেয়েছেন এবং ব্যবহার করতে চেয়েছেন তা হলো 'দারিদ্র'। কুরআন মজীদ অনুযায়ী, আমরা সকলেই মুখাপেক্ষী। কুরআন বলে :

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, অতীব প্রশংসিত।

সূরা ফাতির : ১৫ (৩৫:১৫)

আমরা সকলেই মুখাপেক্ষী এবং কেবল আল্লাহ তাআলাই ধনী এবং অমুখাপেক্ষী। অনেক মানুষই এটি বোঝে না। ইমাম হোসাইন (আ.) ঘোষণা করেন যে, তিনি এটি বোঝেন এবং এটি স্বীকার করেন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য তিনি তা ব্যবহার করতে চান। তারপর ইমাম (আ.) বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি তাঁর দারিদ্র নিয়ে উপস্থিত হতে চান তখন একটি সমস্যা দেখা দেয়, সেই দারিদ্র আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। এ বিষয়ে জোর দিতে হবে যে, দারিদ্র কেবল একটি দিক থেকে; দারিদ্র আল্লাহতে পৌঁছতে পারে না। এর আরেক অর্থ হলো যে, যে দারিদ্র সহ যায় সে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে তখন যখন সে ধনবান হয়। ধনবান হওয়ার জন্য আপনাকে দারিদ্রকে সাথে নিতে হবে, কিন্তু যারা অনুভব করে যে, তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র, তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ধনবান। যে সবচেয়ে বিনম্র, আল্লাহ তাআলা তাকে সকলের চেয়ে ঊর্ধ্বে উঠাবেন। যেমনটি আমরা একটি হাদীসে পাই, 'যে আল্লাহ তাআলার খাতিরে বিনম্র হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ঊর্ধ্বে উঠান।'[৭] একটি হাদীসে কুদসীতে আমরা দেখি যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে কেন নবী করেছিলেন সেটি বলেছিলেন যে, তিনি সকল মানুষের অন্তরে দৃষ্টি দিলেন এবং মূসা (আ.)-এর অন্তরকে সবচেয়ে বিনম্র পেলেন।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীস অনুযায়ী, যে ব্যক্তি অহমিকা পরিহার করে এবং আল্লাহ তাআলার সামনে বিনম্র হওয়াকে পছন্দ করে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করে সে অন্যের অথবা তার নিজের ইচ্ছার দাস থাকে না। সে এক ধরনের প্রভুত্ব অর্জন করে।

'আল্লাহর দাসত্ব এমন বিষয় যার সার হলো প্রভুত্ব।'[৮]

আরেকটি হাদীসে আমরা পড়ে থাকি–

হে আমার বান্দা! আমার আনুগত্য কর। [যদি তুমি তা কর] আমি তোমাকে আমার দৃষ্টান্তে পরিণত করব। আমি জীবন্ত এবং কখনই মৃত্যুবরণ করব না, আমি তোমাকে জীবিত রাখব এবং কখনোই মৃত্যু ঘটাব না। আমি ধনী এবং কখনই দরিদ্র হব না,

তাই আমি তোমাকে ধনবান বানাব এবং কখনই তুমি দরিদ্র হবে না। যা আমি চাই সেটাই হয়, তাই আমি তোমাকে এমন বানাব যে, যা তুমি চাইবে সেটাই হবে।[৯]

মহানবী (সা.)-এর জীবনীর দিকে কেউ দৃষ্টি দিলে বিনম্রতার পরিপূর্ণ নমুনা দেখতে পাবে। নিশ্চয়ই মহানবী (সা.)-এর শেষ নবী হওয়া এবং সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ তাঁকে দেয়ার পেছনে যে কারণ নিহিত তা হলো তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সত্যিকার বান্দা এবং তাঁর সামনে ও তাঁর মানুষের সামনে সবচেয়ে বিনম্র ব্যক্তি ছিলেন তিনি। একদিনে কমপক্ষে নয়বার মানুষ তাদের নামাযে এই সাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সা.) ছিলেন আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর নবী। এর অর্থ হলো তাঁর সকল গুণের মধ্যে দুটি ছিল ব্যতিক্রমী: প্রথমত তিনি মহান আল্লাহর একজন বান্দা হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি আল্লাহর নবী মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়েছেন।

মহানবী (সা.) এতটাই বিনম্র ছিলেন যে, তিনি নিজে কখনোই আত্মগর্ব করেননি; তিনি কখনোই অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাবেননি। তিনি কখনোই নিজেকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পৃথক করেননি এবং সবসময় খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। যখন তিনি একাকী এবং শক্তিহীন ছিলেন এবং যখন তিনি সমগ্র আরব উপদ্বীপ শাসন করতেন এবং মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে তাঁকে অনুসরণ করতেন উভয় অবস্থায় তাঁর আচরণ ছিল অভিন্ন। তিনি খুব সাধারণভাবে থাকতেন এবং সবসময় মানুষের সাথে, বিশেষ করে দরিদ্রদের সাথে থাকতেন। তাঁর কোন প্রাসাদ ছিল না, প্রহরীও ছিল না। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসতেন তখন তাঁর বসার জায়গা বা পোশাক দেখে তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারত না। কেবল তাঁর কথা এবং আধ্যাত্মিকতা দেখেই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যেত।

ওফাতের কিছুদিন আগে মহানবী (সা.) মদীনার মসজিদে ঘোষণা করলেন : ‘ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মনে করে যে, আমি তার প্রতি অন্যায় করেছি তাহলে সে সামনে এস এবং তার প্রাপ্য নিয়ে যাও। নিশ্চয় পৃথিবীতে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া আমার কাছে অধিকতর উত্তম মনে হয় কিয়ামতের দিন ফেরেশতা ও নবীদের সামনে জবাবদিহিতা করার চেয়ে।’ যাঁরা মসজিদে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কাঁদলেন, তাঁদের জন্য মহানবী (সা.) যেসব আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁদেরকে পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যেসব সমস্যা ভোগ করেছেন সেসব স্মরণ করলেন। তাঁরা জানতেন যে, তিনি কখনোই তাঁর নিজের প্রয়োজনকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেননি এবং কখনোই

তাঁর সুযোগ-সুবিধাকে অন্যের ওপর অগ্রাধিকার দেননি। তাই তাঁরা তাঁর গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তাঁর কথার জবাব দিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যকার একজন সাওদা বিন কায়েস উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোন। হে রাসূলুল্লাহ! তায়েফ থেকে আপনার প্রত্যাবর্তনের সময় আমি আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গিয়েছিলাম যখন আপনি আপনার উটের ওপর ছিলেন। আপনি উটপকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আপনার ছড়ি উঠিয়েছিলেন, কিন্তু ছড়িটি আমার পেটে আঘাত করেছিল। আমি জানি না, সেটি কি ইচ্ছাকৃত ছিল নাকি অনিচ্ছাকৃত।' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'ইচ্ছাকৃতভাবে করার ব্যাপারে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।'

এরপর মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে হযরত ফাতিমার বাড়িতে গিয়ে সেই ছড়িটি নিয়ে আসতে বললেন। ছড়িটি আনা হলে মহানবী (সা.) তাঁর পিঠে আঘাত করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সওদাকে বললেন। সওদা বললেন যে, ছড়িটি তাঁর পেটের চামড়ার ওপর আঘাত করেছিল। তখন মহানবী (সা.) তাঁর জামা উঠিয়ে নিলেন যাতে সওদা তাঁর শরীরের চামড়ায় আঘাত করতে পারে। সেই মুহূর্তে সওদা বললেন : ' হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমার মুখ আপনার পেটে স্পর্শ করার অনুমতি দিবেন?' মহানবী (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন। সওদা মহানবী (সা.)-এর পেটে চুম্বন দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁর এই আচরণের কারণে কিয়ামতের দিন যেন আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করেন। মহানবী (সা.) বললেন : 'হে সাওদা! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে নাকি তুমি এখনও প্রতিশোধ নিতে চাও?' তিনি জবাব দিলেন : 'আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।' মহানবী (সা.) এরপর প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ! সাওদা বিন কায়েসকে ক্ষমা করুন যেহেতু সে আপনার নবী মুহাম্মাদকে ক্ষমা করেছে।'[১০]

সুতরাং ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় বিনম্রতাকে এবং আমরা যে আল্লাহ তাআলার সামনে কিছুই না তা অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল দৃঢ় বিশ্বাসহীন কোন মৌখিক দাবি হিসাবে নয়, কিন্তু অনস্তিত্বের গভীর অনুধাবন থেকে। একদা এক ব্যক্তি ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-কে মসজিদুল হারামে– কাবার পাশে হিজরে ইসমাঈলে দেখল। সে বলল : 'আমি হিজরে ইসমাঈলে গেলাম এবং সেখানে আলী ইবনুল হোসাইন (আ.)-কে নামায পড়তে দেখলাম। এরপর তিনি সিজদায় গেলেন। আমি নিজেকে বললাম:

ইনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ধার্মিক পরিবার থেকে, সুতরাং তিনি সিজদায় যা বলেন তা শুনব।' তারপর তিনি দোয়ার মধ্যে ইমাম (আ.)-এর উক্তিকে তুলে ধরেন : 'হে আমার প্রভু! আপনার ক্ষুদ্র বান্দা আপনার দরজায় এসেছে, আপনার বন্দি আপনার দরজায় এসেছে, যে দরিদ্র সে আপনার দরজায় এসেছে, যে আপনার কাছে ভিক্ষা চায় সে আপনার দরজায় এসেছে।'[১১]

কুরআনে মুমীনদেরকে সতর্ক করছেন যে, যদি তারা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ শীঘ্রই একদল লোককে আনবেন যে, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে থাকবে বিনম্রতা :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের ধর্ম হতে ফিরে যায়, অতি শীঘ্র আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি (আল্লাহ) ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে; বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়-নম্র এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

সূরা মায়িদা : ৫৪ (৫: ৫৪)

ইসলামী সাহিত্যে, বিশেষ করে ইরানী কবিদের দ্বারা আধ্যাত্মিক দরিদ্রতার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রুমী তাঁর মসনভীতে একটি দীর্ঘ কবিতায় নিঃস্ব এবং ছোট হওয়ার অনুভূতির গুরুত্ব এবং অহংকার ও উদ্ধত হওয়ার মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। রুমি যুক্তি দেখান যে, যাকে মানুষ তোষামোদ করে ও যার সামনে নতজানু হয় নিশ্চিতভাবেই তাকে বিষ প্রয়োগ করে। যদি সে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী না হয় তাহলে সে প্রতারিত হতে পারে এবং আত্মগর্ব অনুভব করতে পারে। এইভাবে সে উদ্ধত হয়ে যেতে পারে এবং নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং তার ছোট হওয়ার বোধ কমে যেতে পারে। যখন মানুষ কোন ব্যক্তিকে তোষামোদ করে যে চতুর সে অনুধাবন করবে যে, এটি ক্ষতিকর হতে

পারে। রুমী তাদের প্রশংসা করেছেন যারা উদ্ধতদের বিপরীতে বিনম্র। যে ব্যক্তি বিনম্রতার স্বভাবকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেনি তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে বিষাক্ত মদ পান করে। শুরুতে সে হয়তো আনন্দিত ও খুশি হবে, কিন্তু কিছু সময় পর সে পতিত হবে।

রুমি আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন যা হলো দুই বাদশাহের মধ্যে যুদ্ধ। যখন একজন বাদশাহ যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং বিজয়ী হয় তখন হয়তো সে পরাজিত বাদশাহকে বন্দি করবে অথবা হত্যা করবে, কিন্তু সে কখনই পরাজিত রাজ্যের ভিক্ষুকদেরকে বা দরিদ্র প্রজাদেরকে শাস্তি দেবে না। নিশ্চয়ই সে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং তাদের উন্নতি সাধন করবে। রুমী বলেন যে, এর কারণ হলো এটা যে, এই ধরনের মানুষরা বিনয়ী হয় এবং বাদশাহ হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা তারা পোষণ করে না আর তাই তারা নতুন রাজার জন্য কোন হুমকি নয়। আরেকটি উদাহরণ হলো : একটি কাফেলা যেটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। যখন ডাকাতরা সেই কাফেলায় ডাকাতি করতে আসবে তখন যাদের কাছে অর্থ নেই তারা নিরাপদ থাকবে। অথবা যখন নেকড়েরা আক্রমণ করে তখন সেগুলো সামনে যা পায় সেটার ওপরই আক্রমণ করতে পারে। এমনকি সেগুলো পরস্পরকে আক্রমণ করতে পারে এবং এই কারণেই যখন তারা ঘুমাতে যায় তারা একটি চক্রে বসে যাতে তারা পরস্পরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে। কিন্তু রুমী বলেন, যদি কোন মৃত নেকড়ে থাকে তাহলে সেটা তাকে আক্রমণ করবে না। আমরা জানি যে, নবী খিজির (আ.) একটি নৌকার তলায় ছিদ্র করে দিলেন কারণ সেই এলাকায় একজন অত্যাচারী শাসক ছিল যে সকল নৌকা বা জাহাজকে আটক করত। অতঃপর সেই নৌকাকে রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল সেটাকে অকেজো করে দেয়া। যদি একটি পাহাড় বা টিলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান খনিজ দ্রব্য থাকে তাহলে মানুষ সেই এলাকার দিকে ধাবিত হবে মাটি, বালু ও খনিজ বের করার জন্য সেখানে সমবেত হবে। কিন্তু একটি সাধারণ পাহাড় বা টিলা যার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই সেটা অক্ষত থাকবে। যে ব্যক্তি হাঁটছে সে তার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তার ঘাড় সোজা। অতএব, শত্রুরা হয়তো তলোয়ার দ্বারা তার ঘাড় কর্তন করতে পারে, কিন্তু একজন দুর্বল প্রকৃতির লোকের মাথা কেউ কাটবে না, কারণ, সে এতটাই নম্র যে, কেউ চিন্তা করে না যে, সে কোন হুমকি হতে পারে। যখন একটি মই পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন যে ওপরে উঠতে চায় সে হলো মূর্খ। যখন সেই মইটি পড়ে যাবে তখন তার হাড় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসব উদাহরণ দেয়ার পর রুমী ঘোষণা করেন যে, যা কিছু তিনি বলেছেন সেগুলো শাখাপ্রশাখার মতো যেগুলোর মূল অনেক গভীরে। এখানে মূল নীতিটি হলো এই যে, উদ্ধত বোধ করা হলো আল্লাহর সত্তার সাথে অংশী করা। এটা শির্ক। রুমী বলতে থাকেন যে, যেহেতু তুমি এখনও মারা যাওনি এবং আবার আল্লাহ কর্তৃক জীবন প্রাপ্ত হওনি, তাই তুমি আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ কর না। এমন মৃত্যু ছাড়া, যে স্থানই তুমি নাও তা শির্ক। কিন্তু যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর এবং সত্তাহীন হও, সেটাই, যদি তুমি পুনরুজ্জীবিত হও আল্লাহ কর্তৃক তাহলে তুমি উচ্চ থেকে উচ্চে যেতে পার। এমন অবস্থায়, তুমি যা কিছু ধারণ কর তা আল্লাহর খাতিরে এবং তা ব্যয় করা হবে আল্লাহর খাতিরে। এটাই সত্যিকার তাওহীদ বা একত্ববাদ।[১২]

এটা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র অর্থ হলো কোন কিছু অধিকারে না থাকা এবং একইসাথে সেটাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা। উদাহরণস্বরূপ, যে নিজের মধ্যে মানবীয় পূর্ণতার নির্দিষ্ট কিছু ঘাটতি অনুভব করে এবং একনিষ্ঠভাবে চায় সেই ঘাটতিকে পূরণ করতে সেটা হলো 'ফিক্‌র' (চিন্তা)। উপরন্তু, আরো বলা হয়েছে যে, সুফিবাদে 'ভালোবাসার আকুল আকাঙ্ক্ষা ফিক্‌র থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য)।[১৩] আমি মনে করি দারিদ্রতার বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, দারিদ্রতা কোন কিছু না থাকা এবং তারপর সেটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি কিছু। আমি মনে করি, দারিদ্রতা হলো আমাদের নিরঙ্কুশ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং যতক্ষণ আমরা আমরাতে থাকব ততক্ষণ এই দারিদ্রতা দূর হবে না। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যের বোধ একটি আধ্যাত্মিক উপহার এবং সৎকর্ম যা সবসময়ের জন্য বজায় রাখা উচিত। দারিদ্র্য প্রাচুর্য বা সমৃদ্ধির ক্ষণস্থায়ী অবস্থান নয়। বরং দারিদ্র্য স্বয়ং সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং সৌভাগ্য যা মানুষের রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে উদ্ধৃত হয়েছে : 'আমর সম্মান আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য থেকে। সকল নবী-রাসূল ওপর আমাকে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।[১৪]

উপসংহার

এই প্রবন্ধে ভালোবাসার বিষয়টিকে ইসলামের নিরাপদ অবস্থান এবং একজন প্রকৃত মুনিনের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে আলোচনা করেছি। জ্ঞান, অনুধ্যান এবং

আল্লাহর রহমত আমাদের ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী, কৃতজ্ঞতাকে বিশ্বাসের সমকক্ষ হিসাবে আলোচনা করেছি। কৃতজ্ঞ হওয়ার বিভিন্ন পর্যায় অনুধাবন আমাদেরকে সতর্ক হওয়া এবং সর্বক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা বিনম্রতা ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য নিয়েও আলোচনা করেছি যার মাধ্যমে একজন ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে পারে এবং দুঃখ ও কষ্ট থেকে উপশম পেতে পারে। এই মতবাদ এটা ইঙ্গিত করছে না যে, মানুষের কোন মূল্য নেই; বরং তা মানুষের মূল্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে : আমরা পূর্ণতম ও সর্বপবিত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে আমরা পূর্ণতার নিকট থেকে নিকটবর্তী হব।

আল্লাহ আমাদেরকে এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন যে, তাঁকে আমাদের কতটা প্রয়োজন, তিনি আমাদেরকে কতটা দিয়েছেন, কিভাবে তাঁর কাছে সর্বোচ্চ উপায়ে প্রার্থনা করা যায়, কিভাবে তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন যাতে আমরা আলোকিত ও পবিত্র হতে পারি। এটাই আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা এবং এতে কোন সীমা নেই। আল্লাহ সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং আমাদের প্রতি দয়ালু হওয়ার সকল কারণই রয়েছে, আর যদি কোন বাধা থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের কারণেই।

হে আল্লাহ! আমাকে কবুল কর
দারিদ্র্যের প্রাচুর্য
এমন উদার দানের মধ্যেই
আমার ক্ষমতা ও গৌরব।
(হাফিয শিরাজী)

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

বন্ধুত্ব গড়ার রীতি ও কৌশল

সাইয়্যেদ মাহমুদ মারভীয়ান হোসেইনী

ভূমিকা

ইসলাম হলো সবচেয়ে সামাজিক একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং কুরআন অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে, ধারাবাহিক এবং গঠনমূলক সম্পর্কের জন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠

'হে বিশ্বাসিগণ! (ধর্মের বিষয়ে) ধৈর্যধারণ কর এবং অপরকেও ধৈর্যধারণের শিক্ষা দাও; আর (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[১]

কুরআন মজীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুমীনরা হলো পরস্পর ভাই ভাই[২], যার অর্থ হলো তারা একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা এবং আন্তরিকতা অনুভব করে, এবং এমনকি ঐশী নবীগণকেও জনগণের ভাই[৩] হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটা ধর্মীয় সমাজে বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ নমুনা এবং একটি সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে।

---

১. সূরা অলে ইমরান : ২০০
২. সূরা হুজুরাত : ১০
৩. সূরা শুআরা : ১০৬, ১২৪, ১৪২

বন্ধুত্ব হলো মানব জাতির স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং তাদের সামাজিক জীবনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং বিভিন্ন সমাজে সবসময় এটি ছিল, কিন্তু ধর্ম সমাজের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করে এটাকে সবচেয়ে উত্তমভাবে ব্যবহার করেছে, একে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বিবেচনা করে।

বন্ধুত্বের সুযোগ সংস্কৃতি ও সামাজিক বিনিময়ের একটি স্বাভাবিক ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়, তাই মানুষ অধিক বন্ধুত্বের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে । বন্ধুত্বের মাধ্যমে নৈতিকতা ও উত্তম আচরণ যেমন তেমনি অনৈতিকতা ও মন্দ আচরণও খুব সহজেই এবং কখনো কখনো অসচেতনভাবে বিস্তৃত এবং স্থানান্তরিত হয় । এজন্যই সরকার ও ক্ষমতার অধিকারীরা মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় সমাজের বন্ধুত্বের সংস্কৃতি তৈরি করে যাতে তারা যে ধরনের গ্রহণযোগ্যতা চায় তা পেতে পারে।

ইসলাম খবু ভালোভাবে বন্ধুত্বের সুযোগের গভীর প্রভাব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝেছে। এর শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবারের আচার-আচরণের মধ্যে ইসলাম বন্ধুত্বের বিষয়ে সব ধরনের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেছে। ধর্মীয় সমাজে বন্ধুত্বের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ভূমিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম একদিকে সম্পর্কের উন্নয়নের চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে নৈতিকতার উন্নয়ন এবং জনগণকে শিক্ষা দেয়ারও চেষ্টা করেছে।

এই গ্রন্থ ধর্মীয় ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বন্ধুত্বের সংস্কৃতির ব্যাপক ও উপকারী ক্ষেত্র সম্পর্কিত একটি ভূমিকা।

বন্ধুত্বের সংজ্ঞা

মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পর্ক যাদের একটি অভিন্ন পছন্দ, আকর্ষণ এবং সংস্কৃতি রয়েছে সেটাকে বন্ধুত্ব বলে।

বন্ধুত্ব এবং মানবীয় চরিত্রের ওপর এর গভীর প্রভাব

মানুষের জন্য বন্ধু থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং একটি আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। একাকিত্বের অনুভূতি হলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে চূর্ণকারী অন্যতম প্রধান বিষয়। বন্ধু এবং বন্ধুত্ব জীবনের কাঠিন্য, জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহের বিপরীতে মানুষের সহনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। গবেষকদের মতে যেসব অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীর স্বল্পসংখ্যক বন্ধু রয়েছে তারা যেসব রোগীর বিপুল সংখ্যক সম্পর্ক রয়েছে অথবা সমর্থনকারী ও সুখী পরিবার রয়েছে তাদের চেয়ে দ্রুত মৃত্যুবরণ করে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, আমরা একটি দলের অন্তর্ভুক্ত এবং একটি দলের সদস্য। এই ধরনের সদস্য হওয়ারা নিজস্ব কিছু সযোগ-সুবিধা রয়েছে যার একটি হলো নির্ভর করার মতো একতা; এটি এমন ধরনের বন্ধন যার ওপর মানুষ বিপদ-আপদের সময় নির্ভর করতে পারে।

বন্ধুত্ব মানসিক স্থিরতায় পর্যবসিত হয় এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থান বুঝতে সহয়তা করে, বিপরীতক্রমে অন্যদেরও। এর অর্থ হলো আমাদের কথা, আচরণ এবং আবেগের বিপরীতে আমাদের বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে আমরা আসলে কেমন তা জানতে এবং ভালোমন্দের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে। সর্বশেষে এই অবস্থা আমাদের চরিত্রের ভারসাম্য ও পুনর্গঠনে পর্যবসিত হয় এবং পৃথিবীর নানা পরিস্থিতি ও ঘটনার মোকাবিলায় আমাদেরকে সামর্থ্যকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

বন্ধুত্বের আরেকটি ব্যবহার হলো তথ্য ও দক্ষতার বিনিময় এবং অন্যদের অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করা। বন্ধত্ব হলো অন্যদের সুযোগসুবিধা ব্যবহারের সুযোগ বা সম্ভাবনা উন্নতিকল্পে এবং অতঃপর বাস্তবিকভাবে একজনের সম্পদ বৃদ্ধি।

বন্ধুত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো অন্যদের সাহায্য করা, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির অন্যদেরকে সাহায্য করার সুযোগ এবং তাদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা সামাজিক উন্নয়নের সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে সমাজের উন্নয়নে তাদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এর দ্বারা সেই ব্যক্তির আত্মমর্যাদা লাভ করে এবং অন্যদের চরিত্রের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এই সবকিছু ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করে

এবং পর্যায়ক্রমে তার নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হবে এবং সবশেষে পূর্ণ মানবীয় চরিত্র অর্জনের দিকে পথচলা যা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা।

বন্ধুত্ব (চিন্তাপূর্ণ বন্ধুত্ব) একজন ব্যক্তিকে একটি দলে পরিবর্তন করে, এটি আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং এর পনর্গঠন বা সংস্কারের এবং মানুষকে পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

এটি এই পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে যে, অন্য মুমীনের প্রতি ভালোবাসা বা আকর্ষণ হলো বিশ্বাসের অন্যতম উচ্চতম পর্যায়[১] এবং ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বন্ধু হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছিলেন।[২]

যে ব্যক্তি নিজেকে বন্ধুত্বের ব্যবহারিক সংস্কৃতি হতে বঞ্চিত করে সে অনেক সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং একজন নিঃসঙ্গ ও অক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন : 'মুমিন হলো বন্ধু এবং সাথি এবং অন্যরা তার সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তার কোন মূল্য নেই যে অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করে না (অর্থাৎ বন্ধুত্বের গণ্ডিতে প্রবেশ করে না) এবং যাকে বন্ধু করা হয় না।[৩]

ইসলামের মহান ব্যক্তি মহানবী (সা.) বন্ধুত্বকে আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং বলেছেন : 'যদি আল্লাহ কাউকে অনুগ্রহ করতে চান, তিনি তাকে একটি ভালো বন্ধু দেন, যে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যখন সে (বিষয়সমূহ) ভুলে যায় এবং যে তাকে সাহায্য করবে যখন সে (বিষয়সমূহ) মনে রাখে।[৪]

যারা তাদের সাথিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় অথবা যারা যেমনটা আশা করে তেমনভাবে সদস্য বা বন্ধু হিসাবে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় না তারা চারিত্রিক অস্থিরতায় ভোগে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত এবং তারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য এবং সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে।[৫]

---

১. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব কুলায়নী, কাফী, গবেষক : আলী আকবার গাফফারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫
২. সূরা নিসা : ১২৫
৩. মোল্লা মাহদী নারাকী, জামেউস সাআদাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫
৪. বিহার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ১৬৪
৫. আলী শরীয়ত মাদারী, শিক্ষার মনস্তত্ত্ব, পৃ. ২৫৪

এটি বিবেচনা করা উচিত যে, বন্ধুত্ব কোন দুর্ঘটনা বা আকস্মিক বিষয় নয় এবং সহজ বিষয় নয়; বরং একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া– মানবজাতির গন্তব্যে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সেখানে অনেক ফাঁদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। এই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং একে উন্নত করা, এর প্রয়োজনীয় ধারাকে সংরক্ষণ করা এবং এর পথে যেসব সমস্যা আসে সেগুলোকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করার জন্য একজনের প্রয়োজন প্রতিবিম্ব, কর্মকাণ্ডের একটি পরিকল্পনা এবং দক্ষতা। এটা বলাটা খুবই সহজ যে, তোমার বন্ধুত্ব শুরু কর এবং সবকিছুই নিজে নিজে কাজ করবে।' এটা এটাকে বিশ্বাস করার মতো যে, সুইচে চাবি দিয়ে দাও, সীটে গা এলিয়ে দাও এবং গাড়িকে সেটার ওপরে ছেড়ে দাও, তাহলে একজন সড়কে গাড়ি চালাতে পারবে। এটি সম্পূর্ণরূপে তার বিপরীত। একটি ঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম তুলনা, প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ, নানা জটিল দক্ষতা। বন্ধুদের পছন্দ করা, বন্ধুদের প্রয়োজনগুলোকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা, বন্ধুদের প্রতি সঠিক আচরণ, শারীরিক ও মানসিক আচরণে বন্ধুত্বকে প্রকাশ করা মহিমান্বিত ও যথাযথ উপায়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পরিচালনা ও শক্তিশালী করার জন্য আস্থা তৈরি, বন্ধুত্বের বিপর্যয়ের হেতু নিয়ে কাজ করা এবং বন্ধুত্বের সীমাবদ্ধতাগুলোকে নির্দেশ করা ইত্যাদির মতো দক্ষতা।

বন্ধু পছন্দ করার নীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ দুটি বিষয় উত্তম বন্ধু পছন্দ করাকে নির্দেশ করে :

১. পরিস্থিতি ছাড়া বিশেষ করে বন্ধু ও সমবয়সীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মানুষের বিশাল সম্ভাবনা

২. এই প্রভাবের পর্যায়ক্রমিক ও লুক্কায়িত প্রকৃতি

বন্ধুত্ব হলো মানুষের বিনিয়োগ এবং বন্ধু হলো জীবনের স্থায়ী বিনিয়োগ। কোন চতুর ব্যবসায়ী আকস্মিকভাবে এবং কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার পণ্যকে পছন্দ করে? কোন্ ভ্রমণকারী একজন সমমনা সাথি ছাড়া তার যাত্রা শুরু করে? কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি তার আয়নাকে পছন্দ করে যা দ্বারা সে তার নিজেকে মূল্যায়ন করে।

কোন বিশ্বাসী গবেষণা এবং অনুসন্ধান ছাড়া তার ধর্মকে পছন্দ করে? এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় নেতাগণ কী বলেছেন আসুন বিবেচনা করি :

মহানবী (সা.) বলেন : 'প্রথমে তোমার বন্ধুকে পছন্দ কর, তারপর তোমার ভ্রমণ শুরু কর।' তিনি আরো বলেন : 'একজন মুমিন আরেক মুমিনের আয়না এবং প্রত্যেকের তার বন্ধুর ধর্ম আছে।'

এসব অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু পছন্দ করার বিষয় বলা হয়েছে এবং বন্ধু খোঁজার নীতি সামনে বলা হবে। বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানবচরিত্রের ভিত্তির এসব বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। ধর্মীয় বাণী এবং মানব বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে :

ক. **আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব**

তাওহীদ হলো ইসলামী চিন্তাধারার সবচেয়ে মৌলিক উপাদান এবং এই বাস্তবতার ওপর মানব প্রকৃতির সবচেয়ে স্পষ্ট ও লুক্কায়িত নির্ভরতা রয়েছে। আল্লাহকে ব্যতীত সকল মাধুর্য তিক্ততায় পর্যবসিত হবে এবং আল্লাহর সাথে সকল কাঠিন্য হলো সফলতা।

ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর দোয়ায়ে আরাফায় বলেন : 'হে আমার প্রভু! যে তোমাকে হারিয়েছে সে কিছুই অর্জন করেনি আর যে তোমাকে খুঁজে পেয়েছে সে সবকিছুই পেয়েছে..।'[১]

একটি হিতকর বন্ধুত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তা আল্লাহর জন্য হওয়া, যা ঐশী অনুগ্রহ, ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি আনতে পারে।

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় একনিষ্ঠতা থেকে– লোভ থেকে নয়। এর মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল– অগভীর ও মিথ্যা বিষয়ের ওপর নয়। এটি বিশ্বাসের নিমিত্ত– বস্তুগত লাভের নিমিত্ত নয়। এটি মৃত্যুপরবর্তী জীবনেও টিকে থাকে, এই জীবনের সংক্ষিপ্ত দিনগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'আল্লাহ ছাড়া অন্য

১. শেখ আব্বাস কুমী, মাফাতিহুল জিনান

কোন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা হলো বিপথগামিতা এবং এর ওপর নির্ভর করা অসম্ভব।' [১]

তিনি আরও বলেন : 'ঐশী বন্ধুদের একটি দৃঢ় বন্ধুত্ব রয়েছে, তাদের বন্ধুত্বের অভিপ্রায়ের কারণে।' [২]

খ. প্রজ্ঞা

মানুষের জীবন নতুন নতুন ঘটনায় পরিপূর্ণ। এসব ঘটনায় নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়, যে সমস্যাগুলোর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তার নেই এবং কিভাবে সেগুলোর সমাধান করতে হবে তা সে নাও জানতে পারে। জ্ঞানী বন্ধুরা যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা মুক্তভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে আমাদেরকে যে উপদেশগুলো দেয় সেগুলো হলো সেই পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'একজন সৎ জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে চলাফেরা করো না, একজন পুণ্যাত্মা প্রাজ্ঞ ছাড়া কারো সাথে মেলামেশা করো না এবং একজন বিশ্বস্ত মুমীন ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে তোমার গোপন কথা প্রকাশ করো না।'[৩]

গ. ঘনিষ্ঠতা

অনেক মানুষ আছে যারা কঠিন ও বিপদাপন্ন অবস্থায় তাদের বন্ধুত্ব থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় এবং তাদেরকে বিরক্ত না করতে বলে। এসব বন্ধু কেবল সাফল্যের সময়ের বন্ধু। বন্ধুত্ব শুরু হয় উভয় পক্ষ থেকে সমআচরণ দ্বারা এবং যা একে নষ্ট করে তা হলো একদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্যদিকে অনুগত হওয়া।

---

১. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী রেইশাহরী, মীযানুল হিকমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০
২. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী রেইশাহরী, মীযানুল হিকমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭
৩. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'আমি তোমার জন্য সৎ ও নিষ্ঠাবান ভাইদের বন্ধুত্ব কামনা করি, কারণ, তারা অনুগ্রহ বা প্রাচুর্যের সময় ভালবাসার উৎস এবং বিপদের সময়ে তারা নিরাপত্তার মাধ্যম।'[১]

ঘ. মহানুভবতা

কিছু কিছু মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য, সামাজিক অবস্থান অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিদিত, কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ এর পাশাপাশি মহানুভবও বটে।

সুবিদিত হওয়া মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার ফল, কিন্তু মহানুভবতা আসে আত্মা ও চরিত্রের উন্নয়ন দ্বারা। একজন মহানুভব ও মহৎ চিন্তার মানুষ অন্যের উত্তম কর্ম দেখে, সে আশাবাদী হয়, তার নিজের স্বার্থে কাউকে প্রতারণা করে না। সে যশ ও সম্মানের আকর। সে অন্যদের অপকর্মের মোকাবিলায় ধৈর্যশীল, সে সুউচ্চ হৃদয়ের অধিকারী এবং প্রফুল্ল এবং অন্যদের প্রতি দয়ালু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেন : 'সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলো সে যে উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন ও মহানুভব ব্যক্তিদের সাথে মেশামেশা করে।'[২]

আর তিনি একদিন তাঁর বন্ধু ও সাথিদের বলেন : 'মাছির মতো হয়ো না।' তাঁরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'মাছির মতো?' তিনি বললেন : 'তোমরা কি দেখ না যে, মাছি ভালো ও পবিত্র জিনিস পরিত্যাগ করে এবং অপবিত্র ও নোংরা জিনিসের ওপর বসে।'

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'তোমার ভাইদের অজুহাত গ্রহণ কর। তার কোন (বন্ধু) না থাকলে তাকে তা খুঁজতে সাহায্য কর। যদি তুমি জান যে, তোমার ভাইয়ের কিছু প্রয়োজন তাহলে তা তাকে ব্যক্ত করতে দিও না (তার পূর্বেই তার অভাব পূরণ করে দাও)।'[৩]

---

১. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ১৮৭
২. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ১৮৫
৩. নাহজুল বালাগা, পত্র নং ৩১

অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা

একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো সে যে অন্যদের তুলনায় তার বন্ধুর প্রতি অধিক খেয়াল রাখে এবং তাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। সে এটি ভালোভাবেই জানে যে, তার বন্ধু ফেরেশতা নয়, আবার নবী-রাসূলও নয়, অন্য লোকদের মতোই একজন মানুষ মাত্র এবং তাদের চেয়ে একটু ভালো, তাই সে যদি তার বন্ধুর কোন ত্রুটি পায় তাহলে সে তা গোপন রাখে। যদি তার বন্ধু কোন ভুল করে তাহলে সে তার অজুহাত গ্রহণ করে এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়। এসব বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সুন্দর করে এবং সেই বন্ধুর মহানুভবতার স্মৃতিকে স্থায়ী করে।

একজন নিষ্ঠাবান ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো সে যে ইমাম বাকের (আ.)-এর এই নির্দেশনাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে : ‘ তোমার মুসলিম ভাইকে ভালোবাস। তুমি তোমার জন্য যা পছন্দ কর, তার জন্যও তা পছন্দ কর, তোমার জন্য যা পছন্দ কর না তা তার জন্য চেও না। যখন তার কাছ থেকে কিছু চাও তখন তাকে বল এবং সে যখন তোমার কাছে কিছু চায়, তা তাকে দাও। তোমার ভালো কিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করো না; তাহলে সেও তা করবে না। যখন সে তোমার সাক্ষাতে আসে, তাকে স্বাগত জানাও ও সম্মান কর। তুমি তার অংশ্ এবং সে তোমার অংশ; সে যদি রাগান্বিত হয় এবং তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং তার অপছন্দ দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।’[১]

এমন স্বভাব-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি হলো মূল্যবান রত্ন যার সাথে বন্ধুত্ব করা তার প্রাপ্য এবং তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া এবং তার সাহচর্য একটি মূল্যবান সম্পদ বা বিষয়।

বন্ধুত্বের পরীক্ষা

প্রতিটি পছন্দ কোন না কোন ধরনের মূল্যায়ন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বৈশিষ্ট্যের শানক্তকরণের ওপর নির্ভরশীল এবং এর জন্য সর্বোত্তম পথ হলো পরীক্ষা। পরীক্ষা হলো এমন ক্ষেত্র যেখানে খাঁটি বা পবিত্র বিষয় ভেজাল ও অপবিত্র বিষয়

১. মীর্যা হোসেইন নূরা, মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪০

হতে পৃথক হয়ে যায়, কপট তার মুখোশ হারিয়ে ফেলে এবং সত্যিকার বন্ধু থেকে পৃথক হয়ে যায়। এটি একজন মানুষের জন্য এ বিষয়টি জানার সুযোগ যে, কে তার আন্তরিক ভালোবাস, সাহচর্য এবং বন্ধুত্বের মহান উপহার পাবার যোগ্য। যে ধরনের বন্ধুত্ব ঘৃণা ও শত্রুতার জন্ম দেয় এবং মন্দকর্ম ও অপমানের বীজ ছাড়া আর কোন কিছুকে ছড়ায় না, তেমন ধরনের বন্ধুত্ব শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়।[১]

এই ধরনের পরীক্ষা কখনো কখনো কিছু সংখ্যক বন্ধুর মধ্যকার খাঁটিত্বকে প্রকাশ করে এবং কাউকে তার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে বাধ্য করে। যেমনটি ইমাম রেযা (আ.) বলেন : 'যে কেউ মহান আল্লাহর পথে একজন বন্ধু খুঁজে পায় সে প্রকৃতপক্ষে বেহেশতে একটি কক্ষ পায়।'[২]

এই পরীক্ষা কখনো কখনো আমাদেরকে কারো কারো বিষময় বা ক্ষতিকর প্রকৃতিকেও দেখিয়ে দেয় যেমনটি মহানবী (সা.) বলেন : 'মন্দ বন্ধু থাকার চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকা উত্তম।'[৩]

আমাদেরকে আমীরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আ.)-এর এই বাণীকে অনুধাবন করা উচিত : 'পরীক্ষা করা ব্যতীত কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করো না।'[৪]

বন্ধুকে পরীক্ষা করার কৌশল বা পদ্ধতি

ক. ভালোবাসা হলো হৃদয়ের গোপন সংকেত (কোড)। যদি কেউ এক ব্যক্তির অন্তরে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পায়, তাহলে তার জানা উচিত যে, সেই ব্যক্তিরও তার প্রতি একটি নিখাদ ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম ভাবাবেগ ও সহজাত সংকেত, অকৃত্রিম আবেগগত অভিব্যক্তির চেয়ে আলাদা এবং এদের মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্য প্রয়োজন বিচার-বিবেচনা, নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা এবং কখনো কখনো উত্তম ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করা।

---

১. পবিত্র কুরআন দুনিয়াবী কিছুসংখ্য বন্ধুকে কিয়ামতে শত্রু বলে উল্লেখ করেছে, তাদের ছাড়া যারা সৎকর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের বন্ধুত্ব শুরু করেছে : ৪৩ : ৬৭
২. আজীজুল আতারুদী, ইমাম রেযা (আ.)-এর অবস্থান বা মর্যাদা
৩. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ১৯৯
৪. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী রেইশাহরী, মীযানুল হিকমাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬/১৩

একদা এক ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করল : 'এক ব্যক্তি বলে যে, সে আমার বন্ধু হতে চায়। আমি কিভাবে বুঝব যে, সে সত্যিই আমাকে পছন্দ করে।' ইমাম জবাব দিলেন : 'তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তুমি তাকে ভালোবাস তাহলে সেও তোমাকে ভালোবাসবে।'[১]

খ. তুলনামূলক পদ্ধতি

প্রকৃত বন্ধু হলো সে যে অন্যদের চেয়ে বন্ধুকে প্রাধান্য দেয়। তার বন্ধুর বন্ধুত্ব, আনন্দ ও সাহচর্য অন্যদের চেয়ে বেশি পছন্দ করে। মহানবী (সা.) বলেন : 'একজন প্রণয়শীল বন্ধু হলো সেই যার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : সে অন্যদের সাথে কথা বলার চেয়ে তার প্রিয় বন্ধুর সাথে কথা বলতে, অন্যদের চেয়ে তার সাহচর্যে থাকতে এবং অন্যদের আনন্দের চেয়ে তার আনন্দকে অধিক পছন্দ করে।'[২]

গ. সাহায্য চাওয়া

সুখের সময় নেয়ার বন্ধু অনেকেই আছে, কিন্তু প্রয়োজন ও কঠিন অবস্থায় বন্ধুর সংখ্যা খুব কমই হয়। ইমাম সাদিক (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন : 'একজন বন্ধু তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষিত হতে পারে। যদি তার এসব প্রবণতা থাকে তাহলে তার বন্ধুত্ব খাঁটি ও অকৃত্রিম, অন্যথায় সে সুখের ও কল্যাণের সময়ের বন্ধু, কিন্তু বিপদাপদের সময়ের বন্ধু নয় : তার কাছ থেকে অর্থ ধার চাও, তার কাছে কিছু অর্থ আমানত রাখ এবং তোমার বিপদের সময় তাকে তোমার সাথে থাকতে বল।'

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'যখন তুমি গণনা কর তখন তোমার বন্ধুর সংখ্যা কত বেশি! কিন্তু তোমার বিপদের সময় তা কতই না নগণ্য!

ঘ. উত্তেজিত করার পদ্ধতি

উত্তেজনা হলো গোপন বিষয় প্রকাশ করার একটি উপায়। উত্তেজনার সময় অভ্যন্তরীণ সত্য অবচেতন হৃদয় ও মন থেকে বের হয়ে আসে এবং সেটা তখন ব্যক্তির আচরণে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মানুষ ক্রোধের সময় তার সত্যিকার স্বরূপ

---

১. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ২৪তম খণ্ড, পৃ. ১৭২
২. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার,২৪তম খণ্ড, পৃ. ১৭২

প্রকাশ করে। এমন বন্ধুর সংখ্যা নেহাতই কম যারা ক্রোধের সময় তাদের লুকানো ঘৃণার কথা বলেনি এবং তাদের বন্ধুদের অভিশাপ দেয়নি।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : যদি তুমি তোমার সম্পর্কে তোমার বন্ধুর দাবি সঠিক কিনা জানতে চাও তাহলে তাকে রাগান্বিত কর। যদি সে তোমার বন্ধু থাকে তবে প্রকৃতই সে তোমার বন্ধু, অন্যথায় সে তোমার বন্ধু নয়।

ঙ. প্রাকৃতিক পদ্ধতি

নিসর্গ, ভ্রমণ এবং ব্যক্তিগত জীবন হলো এমন বিষয় যেখানে আনুষ্ঠানিকতা, কপটতা এবং মিথ্যার প্রদর্শনী মানবমনকে ছেড়ে যায় এবং সকল দিক থেকে একজন বন্ধুর দাবির সত্য অথবা মিথ্যার প্রকৃতির মূল্যায়ন করা য়ায় এবং এই অবস্থা বন্ধুর পরিচিতি জানার উত্তম সুযোগ এনে দেয়।

ইমাম সাদিক (আ.) এ প্রসঙ্গে এই উপদেশ দিয়েছেন : 'যে কাউকে বন্ধু বলো না, বরং তাকে একজন পরিচিত বল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার সাথে ভ্রমণ কর।'[১]

নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব হলো একটি সুবর্ণ সুযোগ যা প্রাচুর্যময় বা লাভজনক হতে পারে অথবা কারো সম্পদ ধ্বংস করতে পারে অথবা অনেক ক্ষতিসাধন করতে পারে। সামাজিক মনস্তত্ত্ব সমাজের স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ অস্বাভাবিক সামাজিক গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক প্রভাব নিয়ে কাজ করে।[২]

কিছু সাধারণ নৈতিক ও আচরণগত রোগ বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, এগুলোর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, কপটতা, প্রতারণা, ক্রোধ, সহিংসতা, শত্রুতা, কৃপণতা, পক্ষপাত, সন্ত্রাস এবং দুশ্চিন্তা।

যাহোক, শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে উল্লিখিত রোগগুলো সারিয়ে তুলে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় এবং সে সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক

---

১. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার,২৪তম খণ্ড, পৃ. ১৮০

২. অধিক তথ্যের জন্য দেখুন : স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণ, শোকুহ নাভাভী নেযাদ

শুরু করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যারা সদ্যোযুবক যাদের নিখাদ আবেগ আছে এবং খুবই ভাবাবেগসম্পন্ন তাদেরকে অবশ্যই এসব মানুষের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য এই লাল রেখাকে (রেড বর্ডার) মেনে চলতে হবে।

কতিপয় হাদীসে চার ধরনের নিষিদ্ধ বন্ধুত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে । এর অন্তর্ভুক্তগুলো হলো মূর্খ, কৃপণ, মন্দ কর্মসম্পাদনকারী ও মিথ্যুকের সাথে বন্ধুত্ব।

মানুষের চরিত্র হলো বংশগতি, পরিচর্যা, শিক্ষা, পরিবেশ এবং ইচ্ছশক্তির ফল। পরিবেশ, বিশেষত বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে আড্ডার বিশেষ অনুভূতিগত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

মানুষের মনোভাব একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় আচরণের মাধ্যমে। একটি সময় পর মানুষ তার বন্ধুর আচার-আচরণকে অনুসরণ শুরু করে। উপরন্তু যদি সমাজ ভালো ও মন্দকে একই রকম বিবেচনা করে এবং তাদেরকে বন্ধুত্বের ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে একই রকম সুযোগ দেয় তাহলে সেখানে ভালোর জন্য কোন বাস্তব অনুপ্রেরণা থাকবে না অথবা খারাপের জন্য কোন শাস্তি থাকবে না। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, এই অস্বাভাবিক সামাজিক দলের বিচ্ছিন্নকরণ হলো ক্ষণস্থায়ী এবং যত দ্রুত তারা তাদের অজ্ঞতা, শত্রুতা, মন্দ আচরণ, মিথ্যা ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তারা ধর্মীয় সমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হবে। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'একজন ভালো বন্ধু হলো সুগন্ধি বিক্রেতার মতো এবং একজন মন্দ বন্ধু হলো কর্মকারের মতো। প্রথম জন তোমাকে হয়তো কিছু সুঘ্রাণ দিতে পারে অথবা হয়তো তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনতে পার অথবা নিদেনপক্ষে তুমি মিষ্টি ঘ্রাণ উপভোগ করতে পার, কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে পারে অথবা তোমাকে ময়লালিপ্ত করতে পারে অথবা তুমি তার কাছ থেকে বিশ্রী গন্ধ নিতে পার।[১]

ইমাম আলী (আ.) তাঁর পুত্র ইমাম হাসান (আ.)-কে বলেন : 'মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না, সে তোমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করবে। কৃপণ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তুমি যা সবচেয়ে বেশি চাও সেটি থেকে সে তোমাকে বঞ্চিত করবে। মন্দ কর্মসসম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব করো না, সে তোমাকে সবচেয়ে কম

১. মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার,২৪তম খণ্ড, পৃ. ১৮০

দামে বিক্রি করে দেবে। আর মিথ্যাবাদীর সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে সতর্ক থেকে, সে মরীচিকাসদৃশ, কাছের জিনিসকে দূরে দেখাবে আর দূরের জিনিসকে কাছে।'[১]

বন্ধু ভুল করলে তার সাথে আচরণের করা উচিত

অধিকাংশ মানুষ তাদের সকল প্রতিভা প্রদর্শন করতে পারে না এবং সকল দিক থেকে পূর্ণ নয়, তাই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কম-বেশি 'ভুল' হতেই পারে। কম-বেশি ভুল-ত্রুটি করা, অনুচিন্তন এবং উন্নতি বিধানের জন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ পূর্ণতায় পৌঁছায়।

প্রতিটি পতনই হলো অধিকতর শক্তিশালী হওয়া এবং আরেকবার উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ। একজন বন্ধুর কাছ থেকে পূর্ণতা আশা করা এবং তাকে ত্রুটিহীন বিবেচনা করাটা হলো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ভুল বিষয়। ভুলকে বড় করে দেখা এবং ভুলত্রুটিকে উপেক্ষা করা উভয়টিই ভুল। ভুলকে আরোগ্যযোগ্য রোগসমূহের মতো এবং জবাব দেয়ার মতো প্রশ্ন হিসাবে দেখা উত্তম।

একজনের প্রথমেই উচিত নিজের দিকে তাকানো এবং তার নিজের ত্রুটি ও খুঁতগুলো অনুসন্ধান করা। ইমাম আলী (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন : 'সে কত ভাগ্যবান যার নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে তার অবগতি অন্যদের ভুলগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে তাকে বিরত রাখে!'[২]

এইভাবে বাস্তবাদিতা দ্বারা স্বার্থপরতা দূরীভূত হয় এবং সে একজন যুক্তিবাদী মানুষে পরিণত হয়; যে তার নিজের কাজের সাফাইয়ের পরিবর্তে নিজের ভুলগুলোকে স্বীকার করতে শুরু করে এবং নিজের সম্পর্কে অভিযোগ করে। তারপর তার জন্য অনুতাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। সে তার বন্ধুদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এবং এটি একটি মূল্যবান সামাজিক সংস্কৃতির সূচনা করে। এতে তার বন্ধুরাও নমনীয় হবে এবং সঠিক পথে ধাবিত হবে। এটি কখনই হওয়া উচিত নয় যে, তারা পরস্পরের ভুল অনুসন্ধান করতে শুরু করবে যে সম্পর্কে ইমাম বাকের (আ.) বলেন : 'যদি একজন মুমীন তার ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে তারপর তার ভুল-ত্রুটিগুলো

১. মোহাম্মাদ রেযা, হিকাম আল ইমাম আলী (আ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮
২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮০

অনুসন্ধান করে এই মনোবৃত্তি নিয়ে যে, একদিন তাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য সেগুলো তাদেরকে দেখাবে, তাহলে সে ধর্মদ্রোহীর কাছাকাছি।'

একজন ধৈর্যশীল বন্ধুকে যে মূল্যবান রত্নের চেয়ে দুর্লভ, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং এর পথ হলো আল্লাহর সাহায্য কামনার পাশাপাশি মহানুভবতা, তার ভুলকে উপেক্ষা করা এবং জ্ঞানী উপদেশ প্রভৃতির সমন্বয়।

একজন বন্ধুর মন্দ আচরণকে সংশোধন করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো ধৈর্য ও মনোযোগিতা, এর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো কার্যকরী পদ্ধতির সাথে পরিচিতি। কেউ হয়তো বলতে পারে : 'আমি ভিন্নরূপ চিন্তা করি।' 'তুমি কি মনে কর না যে, এটি এভাবে করাটা উত্তম?' 'আস, একত্রে এ বিষয়টি দেখা যাক।' 'তুমি যা বলছ তা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আরেকটি পদ্ধতিও রয়েছে', এবং 'কেউ কেউ এভাবে চিন্তা করে...।'

আচরণের পরিবর্তন ঘটার জন্য একজনকে ধৈর্যশীল হতে হবে। একজনের উচিত বন্ধুকে হেয় করা, অপমান, মুখ ভার করা অথবা অযথা তাকে অনুগ্রহ করা থেকে বঞ্চিত করার মতো বিষয়গুলোকে পরিহার করা।

কখনো কখনো মৌখিক উপদেশের চেয়ে কথা না বলা এবং একটি চিত্তাকর্ষক অবস্থা তৈরি করা এবং বাধা দূর করার চেষ্টা করা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী। বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা, যেমন অনুপ্রেরণা দান এবং শাস্তি (অর্থাৎ অতিরিক্ত দয়া না দেখানো– শারীরিক শাস্তি নয়), উত্তম পরিবেশ তৈরি করা, বিরক্তিকর অবস্থার পরিবর্তন, গল্পের আকারে কোন কিছু তাদের কাছে ব্যক্ত করা, উত্তম আচরণকে স্বাগত জানানো, দৃষ্টান্ত ও ইতিবাচক আদর্শ উপস্থাপন, সতর্ক করে দেয় এমন প্রশ্ন করা এবং এরকম অন্যান্য বিষয় এই ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে।

বন্ধুত্বের সীমাবদ্ধতা

আমরা একটি বস্তুগত জগতে বাস করি। এই জগতে প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের সীমা রয়েছে। এই সীমাগুলো জানা প্রয়োজন এবং সেই সাথে সেই সীমাগুলো মেনে না

চলার ক্ষতি সম্পর্কে জানাটাও প্রয়োজন। বন্ধুত্বেরও একটি সীমা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রম করা হলো পতনের শুরু।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'বন্ধুত্বের নিজস্ব সীমা রয়েছে এবং যে তা মেনে চলে না সে বন্ধু বলে বিবেচিত হতে পারে না।'[১]

বন্ধুত্বের সীমাগুলোর একটি হলো একজন বন্ধুর উচিত তার ভাইয়ের ভালো এবং মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিজের বলে বিবেচনা করা। তার উচিত নয় তার ভাইয়ের ভুলের প্রতি উদাসীন থাকা এবং যতটুকু সম্ভব তার ভাইকে সাহায্য করা।[২]

বন্ধুত্বের আরেকটি সীমা হলো বন্ধুত্বের বন্ধনের প্রতি নিবেদিত থাকা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা এর একটি শাখা। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'তোমার বন্ধুর গোপনীয়তা প্রকাশ করা হলো বিশ্বাসঘাতকতা।'[৩]

পরামর্শের সময়ও বন্ধুর অধিকার সংরক্ষণ করা উচিত। অতিরঞ্জন এবং তোষামোদ এবং এমন কিছুর দিকে বন্ধুকে পরিচালিত করা যাতে তার কোন কল্যাণ নেই তা হলো বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এমনকি সত্য গোপন করা এবং কপটতাও বিশ্বাসঘাতকতা। একজন বন্ধুর কি স্বচ্ছ আয়নার মতো হওয়া উচিত নয় যা আমাদের বাস্তব অবস্থাকে প্রতিবিম্বিত করে। এজন্যই আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর খেলাফতের শুরুতেই বলেন : 'আমার সাথে এমনভাবে কথা বলো না যেন তুমি উদ্ধত বাদশাহের সামনে কথা বলছ। আমার থেকে দূরে থেক না যেন তোমরা ক্রুদ্ধ লোকজন থেকে দূরে থাক। আমার নিকট থেকে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না এবং মনে করো না যে, তোমাদের নিকট থেকে সত্যকে স্বীকার করা আমার জন্য কঠিন হবে।'

বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে চরম অবস্থানও অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়। বন্ধুত্বের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বন্ধুদের উচিত তার অপর পক্ষের গোপন বিষয় ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জানা। কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে কারো উচিত নয় অন্য কারো নিকট তার এবং তার আত্মীয়-স্বজনের

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, ৭৫তম খণ্ড, পৃ. ৭১

গোপন বিষয় প্রকাশ করা। সময়ের পরিক্রমণ অথবা ভাগ্য আপনার বন্ধুকে আপনার দুশমনে পরিণত করতে পারে এবং তখন আপনার কিছুটা গোপন বিষয় জানা এবং শয়তানের প্ররোচনায় সে আপনাকে অপমান করতে শুরু করতে পারে। ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'বন্ধুর সাথে আচরণে মধ্যপন্থী হও; সে হয়তো কোনদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে এবং তোমার শত্রুর সাথেও আচরণে সীমারেখা মেনে চল; হয়তো সে একদিন তোমার বন্ধু হতে পারে।'[১]

বন্ধুত্বের পদমার্যাদা বা অবস্থানকে সম্মান করাও আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'হে লোকমানপুত্র! যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্বকে খাঁটি করতে চাও, তাহলে তার সম্পর্কে অনুপোযোগী কৌতুক করো না, তার সাথে তর্ক করা পরিহার করো, তার কাছে দম্ভ করো না এবং তার সাথে ঝগড়া করো না।'[২]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : মিকদাদ আহমেদ

১. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ২৫
২. মুহাম্মাদ বাকের মজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ২৯১

বর্তমান চালচিত্র ও যুব সমাজ

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

আমরা যে দুনিয়ায় বসবাস করি সেখানে কার্য ও কারণের প্রাধান্যই মুখ্য। প্রত্যেক ঘটনার পেছনে রয়েছে কোন না কোন কারণের প্রভাব। আবার অন্য কোন কারণের প্রভাবে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ যখন পূর্ণরূপ পায় তখন কার্য সংঘটন অনিবার্য হয়ে পড়ে। মানুষের আচরণও প্রকৃতির এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মানুষ যদি কোন জিনিসের দিকে ঝোকে অথবা কোন জিনিস থেকে বিমুখ হয়, সেটাও এই নিয়মের আওতায় ব্যাখ্যা যোগ্য।

আধুনিক যুব সমাজে ধর্মীয় চেতনা ও মনোভাবে কিছু ঘাটতি চোখে পড়ে বটে। তবে এটাও বলা ঠিক হবে না যে গোটা যুব সমাজই ধর্মীয় চেতনা থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। কেননা, ক্ষেত্র বিশেষে যুব সমাজের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাবের শিথিলতা চোখে পড়ার ঘটনা যেমন সত্য, তেমনি এর বিপরীত ঘটনাও একইভাবে সত্য। কারণ চারপাশে তাকালে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এমনও অজস্র টগবগে যুবককে দেখতে পাব যারা নিষ্ঠাবান, ধর্মভীরু। ইসলামের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা। এ পথে এমনকি স্বীয় জীবনকে উৎসর্গিত করতেও তারা প্রস্তুত। জুমা ও ঈদের নামায, বিভিন্ন মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে তারা তাদের অন্তরের সেই ধর্মীয় আবেগ ও অনুভবকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তবে এখানে দুটি প্রসঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমতঃ যুব সমাজের এই বিশুদ্ধ ধর্মীয় আবেগ ও চেতনার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ইসলামের নামে তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে চালিত না করে। দ্বিতীয়ত ঃ আধুনিকতা ও সভ্যতার কথা বলে পাশ্চাত্য ধাঁচের সমাজের মডেল সামনে এনে যেন বিশেষত শিক্ষিত যুব সমাজকে ধর্মীয় আবেগ ও চেতনা থেকে বিরত না রাখে।

তবে যে সব কারণে যুব সমাজ ধর্মীয় অনুশীলন ও চেতনা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে তার কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেক করা যায় :

১. উৎসাহিত/তিরস্কার করা

কোন শিক্ষা বা সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে হলে সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান একটি গুরুত্পূর্ণ শর্ত। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয় : আচরণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিকড় গাড়ে। আর নিরুৎসাহিত বা তিরস্কার করার কারণে তা নিভে যায়। এ মনোবৈজ্ঞানিক নীতিটি কেবল ব্যক্তির সুকুমার আচরণের বেলায়ই সত্য নয়, বরং এটি একটি সাধারণ নিয়ম বৈকি। যে আচরণ সমাজে উৎসাহিত করা হবে সেটা আচরণকারীর মধ্যে যেমন প্রগাঢ় হবে, অন্যরাও তদ্রূপ তা শিক্ষা ও অনুশীলনে ব্রতী হবে। এক সময় সত্য কথা বলা, সৎভাবে চলা, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা, পাক-পবিত্র হয়ে চলা, আধ্যাত্মিক চর্চা করা, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হত। উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলী হিসাবে সেগুলো তখন সমাজে প্রগাঢ় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। কিন্তু আজকের এ যুগে নেপথ্যে কিছু শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে যারা ধর্মীয় ও ঐশী নির্দেশিত মানবিক আচার অনুষ্ঠানগুলোকে বরং তিরস্কার করে চলেছে। আর তদপরিবর্তে যতসব পাশবিক ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি কালচারকে উৎসাহিত করছে। নারীদের সম্ভ্রম হরণ করে হিজাবকে পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কারের প্রতীক হিসাবে আখ্যায়িত করছে। পক্ষান্তরে উলঙ্গপনাকে সভ্যতা ও উন্নতির নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে। সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত করা আর অসৎকাজে বাধা দেওয়ার ধর্মীয় শিক্ষাকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে প্রচার করছে। আর খোদাদ্রোহী আচরণ ও বক্তৃতাকে বাকস্বাধীনতা হিসাবে উৎসাহিত করছে।

এ বাস্তবতার নিরীখে বলা যায় বর্তমানে কিছু কিছু যুবকের ধর্মবিমুখ হওয়া ও ধর্ম থেকে দূরে সরে থাকার একটি অন্যতম কারণ হল সে সকল উর্দ্ধতন কর্তব্যক্তিদের ভূমিকা, যারা সুন্দরকে তিরস্কার আর অসুন্দরকে পুরস্কার নীতি অবলম্বন করে যুব সমাজের ধর্মীয় অনুশীলনের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। আর তাদের ধ্বজাধারী মিডিয়াসমূহ সেগুলো অবলীলায় প্রচার করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বেড়াচ্ছেন। একটা জিনিস অপ্রিয় হলেও সত্য। তাহল যখন রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা অসৎ ও ধর্মবিমুখ হয় তখন জনগণও তাদেরই পথে অগ্রসর হয়। হাদীসে রয়েছে : الناس علي دين ملوكهم: প্রজারা রাজাদের ধর্মেরই অনুসারী হয়। (দ্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খঃ ১০, পৃঃ ৮) আরো বলা হয়েছে : الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم: জনগণ (ধর্মাচারের ক্ষেত্রে) তাদের পিতামাতার চেয়েও তাদের শাসকবর্গের বেশি সদৃশ। (দ্রঃ বিহারুল আনোয়ার, খঃ ৭৮, পৃঃ ৪৬, হা. ৫৭)

ইদানীং অতীব পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, শাসকবর্গের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানোর নামে নির্বিবাদে বেপরোয়া জীবনাচারকে উৎসাহিত করছেন। তারা প্রকাশ্যে এমন সব ভাষায় বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করছেন যা ধর্মীয় নৈতিকতা বিচারে নিতান্তই খেয়ানত। দুঃখজনকভাবে আমাদের যুব সমাজও এসব অনভিপ্রেত বক্তৃতা বিবৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

২. নগদ ও বাকির হিসাব

আরেকটি কারণ হল নফসানি কামনা বাসনাগুলো নগদ ও তাৎক্ষণিক মজা উপহার দেয়। পক্ষান্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটা এবং আত্মিক সাধনা ও উপাসনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের মজা উপভোগ করাটা একটি অদৃশ্য ও লুক্কায়িত ব্যাপার হওয়া। যেন অনেকটা বাকির খাতায় জমা থাকার ন্যায়। এই নগদ ও বাকির হিসাবে অনেকে সংকীর্ণতার জালে আটকা পড়ে যায়। একজন যুবক যদি তার ফরয নামাযকে নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করতে চায় কিম্বা দান-সদকা প্রদান বা জিহাদ করতে চায়, তাহলে তার দৃষ্টির সামনে জ্ঞান ও মারেফাতের সুদূরপ্রসারী দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া দরকার পড়ে। তাকে অনেক কৃষ্টিবান হতে হবে যাতে তার বুদ্ধি ও বিবেকের গহীনে সুপ্ত ও সমাহিত বোধসমূহ বের হয়ে আসে এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার বিকাশ সাধিত হয়। অথচ যদি কেউ সস্তা সুখের পথ বেছে নেয় তার জন্য তো এতো কষ্ট জয় করার প্রয়োজন হয় না। যে যুবক যৌন কামনায় বিভোর, তার জন্য তো সাধনা করতে হয় না। বয়স ১৫ অতিক্রম করলেই সে একজন সক্ষম যুবক। ইচ্ছেমাফিক পেটের ক্ষুধা ও তলপেটের ক্ষুধা নিবারণ করে নগদ সুখ হাসিল করতে পারে।

যুবকরা স্বভাতই এই কম কষ্টের বিনিময়ে নগদ অর্জন আর প্রচুর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বাকি অর্জনের প্রশ্নে কিছুটা দুর্বল থাকে। আর তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় সমাজের নীতিবোধ ও দায়িত্বহীন অসাধু মহলরা, যারা একদিকে যুবকদের সস্তা কামনা পুরণের সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। অপরদিকে অপপ্রচার চালানোর মাধ্যমে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলে তাদের জীবনাচারে ধর্মীয় অনুশাসনকে বিরোধপূর্ণ ও প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। চূড়ান্ত পরিণতিতে তারা স্লোগান দেয় যে "আমরা এমন ধর্ম চাই যা আমাদের স্বাধীনতা প্রদান করবে।"। অর্থাৎ এমন ধর্ম যা তাদের অবাধ যৌনাচারের পথে বাধা দিবে না। যাবতীয় অন্যায় অনাচারকে বৈধতা প্রদান করবে এবং তাদের যে কোন কামনা ও

খাহেশ পূরণে মুক্ত স্বাধীন রাখবে। যে কোন পন্থায় হোক দুনিয়ার ভোগ বিলাসও নিশ্চিত হবে, আবার পরকালের সুখ শান্তিরও নিশ্চয়তা প্রদান করবে। বলাবাহুল্য, এ সমস্তই প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী। কিন্তু এসব কথা বলেই তারা যুবকদের কুপোকাত করে ফেলে এবং তাদের শুদ্ধ ধর্মীয় চেতনাবোধকে ছিনিয়ে নেয়। ফলে যখন তারা সত্যিকার ধর্মপুরুষদের নিকট সঠিক ধর্মীয় চিন্তা দর্শনকে শ্রবণ করে এবং বুঝতে পারে যে ধর্ম তাদেরকে পূর্ববৎ অবাধ জীবনাচারের অনুমতি প্রদান করবে না, তখন তারা ধর্ম বিমুখ হয়ে যায় এবং নগদ কামনা বাসনার মজায় মেতে ওঠে।

৩. অশ্লীলতা ও অনাচারের কেন্দ্রসমূহের বিস্তার

সমাজের মানুষ গুলো যাতে মানবিক উৎকর্ষের পথ পরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ কিছু নিয়ামক কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমনই একটি নিয়ামক কারণ হচ্ছে তিনি মানুষের অভ্যন্তরে পূর্ণতার প্রতি আগ্রহ ও নেশা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর খোদায়ী হুজ্জাত আক্‌ল তথা বিশুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি ও খোদায়ী সহজাত প্রবৃত্তিকে তার মধ্যে দান করেছেন। আর নবীগণকে প্রেরণ করেছেন ليقوم الناس بالقسط : অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরস্থ এ মহামূল্য হীরামতি সমূহকে বের করে আনতে এবং সমাজে খোদায়ী অনুশাসন বাস্তবায়ন ও সঠিক ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। যাতে সকল অশ্লীলতা ও অনাচার সমাজ থেকে অপসারিত হয়ে যায়। ইসলামী ব্যবস্থারও অর্থ এটা যে নবীর নির্দেশিত ঐ সকল ধর্মীয় নির্দেশনা ও অনুশাসনকে সমাজে জারি রাখা এবং অন্যায়, অশ্লীলতা অধার্মিকতার পথ রোধ করা। কিন্তু যখন শাসকরা একের পর এক অশ্লীলতা ও অনাচারের কেন্দ্র খোলার অনুমতি প্রদান করে আর পাশ্চাত্যের সমালোচনার ভয়ে ধর্মীয় দণ্ডাবলী ও অনুশাসনসমূহ কার্যকরী করা বন্ধ করে দেয় তখন যুব সমাজের মধ্যস্থিত পূর্ণতার প্রতি আগ্রহ ও নেশার পবিত্র স্পৃহার অপমৃত্যু ঘটতে থাকে। পক্ষান্তরে তার পাশব অপরাধ প্রবণতাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠার উসকানি লাভ করে।

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বর্জন

ভণ্ডের দল যখন একটি রাষ্ট্রের বেশিরভাগ পদ-পদবীগুলোকে কুক্ষীগত করে ফেলে, তখন তারা খোদায়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করাকে সহিংসতা বলে অভিহিত করে। ফলে ধর্মের মধ্যে যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কথা বলা রয়েছে

তা, এটাকে তারা অনধিকার চর্চা এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন হিসাবে আখ্যা দেয়। ফলে মানুষ ক্রমান্বয়ে একে অপরের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পালনের ফরয কাজটি বর্জন করতে থাকে। ফলে সমাজে ধর্মের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। যার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হয় যুবসমাজ।

৫. খোসা সর্বস্ব ধর্মচর্চার কারণে ধর্মবিমুখতা

অনেকে আবার এমনভাবে খোসা সর্বস্ব ধর্মচর্চায় ব্যস্ত থাকে যে আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজের নিকট তা নিতান্তই হাস্য রসের খোরাক যোগায়। তাদের এ যুবকরা তিক্ত-বিরক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনপূর্বক ধর্ম থেকে নিজেদেরকে বিমুখ করে রাখাই বরং শ্রেয় মনে করে।

অবশ্য এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে যে কথাটা বলা জরুরী তাহল মহান আল্লাহ ধর্মকে প্রবর্তন করেছেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির দাবিকে সামনে রেখে। ধর্ম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এর বিরুদ্ধ কোন কর্মকাণ্ড বা তৎপরতার পরিণতি হবে নৈরাজ্য, অস্থিতিশীলতা ও হানাহানিপূর্ণ অহনীয় এক জীবন। ধর্মের এ সঠিক বার্তা যদি যুব সমাজের কাছে পৌছে দেয়া যায়, তাহলে মাছ যেমন পানির সন্ধানে উন্মুখ থাকে, তারাও তদ্রূপ একই ভাবে ধর্মের স্বচ্ছ পানিতে অবগাহন করে শান্তি অন্বেষণ করবে। আর জগদ্দল পাথরের মতো যারাই তাদের এ প্রবাহমান পানিরূপী ধর্মের গতি রোধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে তাদেরকে হটিয়ে দিবে। কারণ ইসলামই মানুষের প্রকৃত জীবন সঞ্চার করে। ইরশাদ হচ্ছে : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ: হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তারা তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদের জীবিত করে। (সূরা আনফাল : ২৪)

৬. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

প্রযুক্তির কল্যাণে আজকের যুগে দেশ-মহাদেশ সমূহ আর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বেখবর থাকার সুযোগ নেই। তাই সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামিক স্টেট জঙ্গীদের কর্তৃক ধর্মের নামে যে চরম পৈশাচিক নিষ্ঠূরতা চালানো হচ্ছে তাতে যুব সমাজ আবারো এক বড় ধরনের হোঁচট খেল। একই সাথে ফ্রান্সের 'শার্লি হেবদো' পত্রিকা অফিসে সন্ত্রাসী আক্রমণের সূত্র ধরে প্যারিসে ৬০ লক্ষ লোকের র‍্যালির

আয়োজন, যার পুরোভাগে ছিলেন প্রায় ৬০ টি দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে তারাই বা কিসের বার্তা দিতে চেয়েছে -এটাও যুব সমাজেক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কল্যাণে যুবকরা ঐ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে এমন অনেক চেহারা দেখেছে যাদের আপদ মস্তক শত সহস্র নিরপরাধ মুসলমানের খুনে রক্তরঞ্জিত। শত প্রশ্ন তাই আজকের যুবকের মনে। হোক সে প্রাচ্যের যুবক আর হোক পাশ্চাত্যের। তাহলে কি ধর্মই সভ্য জীবনের অন্তরায়? ইসলামই কি জঙ্গিবাদের শিক্ষা দেয়? ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই কি সব সমস্যার সমাধান?....

ওলীয়ে আমরে মুসলিমীনে জাহান হয়রত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (হাফাযাহুল্লাহ) যেন যুব মনের সেই মত প্রশ্নের সমাধান দেয়ারই চেষ্টা করেছেন সম্প্রতি তাঁর এক বার্তার মাধ্যমে। যদিও বার্তাটি তিনি পাশ্চাত্য যুবককে উদ্দেশ্য করেই প্রদান করেছেন, কিন্তু অবশিষ্ট বিশ্বের যুব সমাজের জন্যও তার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে অনেক দিক-নির্দেশনা। তাই পরিশেষে রাহবারের সেই বার্তাটি সকল যুব সমাজের উদ্দেশে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন :

> ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশের অনুরূপ ঘটনাবলী আমাকে তোমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তোমাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলছি এই কারণে না যে তোমাদের পিতামাতাকে আমি উপেক্ষা করছি। বরং এই কারণে যে তোমাদের জাতি ও দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে, আর একারণেও যে তোমাদের মধ্যে সত্যান্বষণের তেজোদ্দীপ্ত অনুভূতি ও একাগ্রতা দেখতে পেয়েছি। তোমাদের রাজনীতিকগণ ও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করেও আমি লিখছি না, কারণ আমি বিশ্বাস করি তারা সচেতনভাবে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে রাজনীতির পথকে আলাদা করে রেখেছে। তোমাদের সাথে আমি ইসলাম নিয়ে কথা বলতে চাই। বিশেষত তোমাদের কাছে যেটাকে ইসলাম বলে উপস্থাপন করা হয়, সেটা নিয়ে।
>
> সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর থেকে শুরু করে বিগত প্রায় দুই দশক কাল যাবৎ এই মহান ধর্মকে ভয়ঙ্কর শত্রুর আসনে বসানোর বহু চেষ্টা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের মনে ভয় ও ঘৃণার অনুভূতিকে উসকে দিয়ে এ থেকে ফয়দা কুড়ানোর এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে পশ্চিমা রাজনীতিতে। যে বিভিন্ন ফোবিয়া দিয়ে পাশ্চাত্যের জাতিগুলোকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও আমি এখানে কথা বলতে চাই না। ইতিহাসের সাম্প্রতিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলোর উপর এক নজর দিলেই তোমরা বুঝতে

পারবে যে, অন্যান্য জাতি ও সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমা সরকারগুলোর ভন্ড ও মুনাফিকি আচরণের নিন্দা করা হয়েছে অধুনা ইতিহাসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ইতিহাস দাসত্বের কারণে লজ্জিত, ঔপনিবেশিক আমলের কারণে বিব্রত এবং যাদের গায়ের চামড়া ভিন্ন ও যারা খ্রিষ্টান নয়, তাদের উপর নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যানদের মাঝে ধর্মের নামে কিম্বা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয়তার নাম করে ঘটানো রক্তপাত নিয়ে তোমাদের গবেষকগণ ও ইতিহাসবেত্তাগণ গভীরভাবে লজ্জিত। এগুলো প্রশংসাযোগ্য নয়।

এই দীর্ঘ ফিরিস্তির একটি ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ করার মাধ্যমে আমি ইতিহাসের নিন্দা করছি না বরং আমি চাই তোমরা তোমাদের বুদ্ধিজীবিদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে কেন পশ্চিমা জনগণের বিবেক জেগে উঠতে কয়েক দশক বা শতাব্দী কাল লেগে যায়? সমন্বিত বিবেকবোধ কেন সুদূর অতীতের উপরই শুধু প্রযোজ্য হবে, কেন বর্তমান সমস্যাগুলোর উপরেও নয়? কেন ইসলামী চিন্তা ও সংস্কৃতিকে স্বাগতম জানাবার মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণসচেতনতা ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়?

তোমরা খুব ভাল করেই জান যে ঐ সকল সুবিধাবাদী জালিমদের সাধারণ ভিত্তি ছিল 'অন্যদের' সম্পর্কে কাল্পনিক ভীতি ও ঘৃণা ছড়ানো, অপরকে অপমানিত করা। এখন আমি চাই তোমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করো : কেন ঘৃণা ও আতঙ্ক ছড়ানোর পুরাতন পন্থা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নজিরবিহীন তীব্রতাসহকারে আক্রমণ করেছে? কেন দুনিয়ার বলদর্পীরা চায় যে ইসলামী চিন্তাধারা হারিয়ে যাক, লুক্কায়িত থাকুক? ইসলামের কোন্ কনসেপ্ট পরাশক্তিদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং ইসলামের প্রকৃত চেহারাকে বিকৃত করার আড়ালে কোন্ স্বার্থকে রক্ষা করা হয়?

কাজেই আমার প্রথম অনুরোধ হল : ইসলামের চেহারাকে মলিন করার নেপথ্যে সুদুরপ্রসারী এই অভিসন্ধি নিয়ে তোমরা পড়াশোনা ও গবেষণা করো।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ হলো : ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত ও তুমুল মিথ্যা প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় তোমরা এই ধর্মটির সম্পর্কে সরাসরি জানার চেষ্টা করো।

একটি সুস্থ যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক দাবি এই যে, তোমাদেরকে তারা ভয় দেখিয়ে যা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে সেটার আসল রূপ ও ধরণ

সম্পর্কে জানবে। আমার ব্যাখ্যা কিম্বা ইসলামের অন্র কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেও আমি জোর করছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল : বর্তমান দুনিয়ার এই প্রগতিশীল বাস্তবতার সাথে পরিচয় পক্ষপাতদুষ্টতা ও ঘৃণার মাধ্যমে হতে দিও না। তাদের নিজেদের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদেরকে ইসলামের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিদ করাতে দিও না। ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক উৎস থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করো। পবিত্র কোরআন ও মহান নবীর জীবন থেকে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করো। আমি প্রশ্ন করতে চাই : তোমরা কখনো মুসলামানদের কোরআন সরাসরি পড়েছ কিনা? ইসলামের নবীর শিক্ষা ও তাঁর মানবিক ও নৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তোমরা গবেষণা করেছ কিনা? মিডিয়া ছাড়া আর কোন উৎস থেকে তোমরা কখনো ইসলামের বাণী হাতে পাওয়ার চেষ্টা করেছ কিনা?

তোমরা কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছো : দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে কোন্ আদর্শের উপর ভিত্তি করে এবং কীভাবে? বিশিষ্ট সব বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের উত্থান গটিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে? আমি চাই, তোমরা যেন এ সমস্ত অবমাননাকর ও আক্রমণাত্মক প্রচারণাকে বাস্তবতা ও তোমাদের মাঝে আবেগের বাঁধ সৃষ্টি করতে না দাও। নিরপেক্ষ বিচার করার সম্ভাবনাকে কেড়ে নিতে না দাও। বর্তমান যুগে যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ ভৌগলিক সীমারেকাকে তুলে দিয়েছে। সুতরাং তারা যেন তোমাদেরকে মনগড়া চিন্তার সীমান্তে বন্দী করে না ফেলে।

যদিও কেউ একাকী এই শূন্যস্থানগুলোকে পূরণ করতে পারবে না, তদুপরি তোমরা প্রত্যেকে চিন্তা ও সৌন্দর্যের এক সেতুবন্ধন তৈরী করতে পারো। যেন নিজেদেরকে ও পরিপার্শ্বকে আলোকিত করতে সক্ষম হও। যদিও ইসলাম ও তোমাদের তরুণদের মাঝে সৃষ্ট এই পূর্ব-পরিকল্পিত চ্যালেঞ্জ অযাচিত, কিন্তু এটা তোমাদের আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা তোমাদেরকে নতুন সত্য আবিস্কারের উপযুক্ত সুযোগ এনে দেবে। তাই ইসলামের সঠিক, সত্য ও নিরপেক্ষ ধারণা অর্জনের এই সুযোগ তোমরা ছেড়ে দিও না। যাতে আশা করা যায়, সত্যের প্রতি তোমাদের দায়িত্ববোধের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই যোগাযোগের ইতিহাসকে আরো পরিচ্ছন্ন বিবেক ও কম বিরোধিতা সহকারে লিখতে পারে।

ধর্ম ও দর্শন

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হওয়ার অকাট্য প্রমাণ

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ‘উলুল আম্‌র’

ইসলাম এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হওয়ার অকাট্য প্রমাণ

ড. মোহাম্মাদ মোহাম্মাদরেযায়ী

আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণের অন্যতম পন্থা হচ্ছে বিশ্বজগত সৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি তথা অস্তিত্বের (وجود – Existence) অপরিহার্য অস্তিত্ব (واجب الوجود – Essential Existence) ও সম্ভব অস্তিত্ব (ممكن الوجود – Possible Existence) এ দুই ধরনের হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করা। অন্য কথায়, বিশ্বজগত ও এর সব কিছুর সৃষ্ট হওয়া থেকে আমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

আমরা প্রথমে এ বিষয়ে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করবো এবং এরপর এর ভিত্তিতে বিশ্বজগতের সৃষ্ট হওয়ার ধারণার সত্যতার সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ (برهان) উপস্থাপন করব :

(١) الدالّ على قدمه بحدوث خلقه و بحدوث خلقه على وجوده.[১]

'(তিনি হচ্ছেন এমন এক রব্ যিনি) স্বীয় সৃষ্টি নিচয়কে সৃষ্টির মাধ্যমে এবং স্বীয় সৃষ্টিকে অস্তিত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের ও স্বীয় অনাদি হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।'

(٢) مستشهد بحدوث الأشياء على ازليته.[২]

'তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি নিচয়ের সৃষ্ট হওয়াকে স্বীয় অনাদিত্বের প্রমাণে পরিণত করেছেন।'

(٣) الحمد لله .... الدالّ على وجوده بخلقه و بمحدث خلقه على ازليته.[৩]

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি... স্বীয় সৃষ্টিকে স্বীয় অস্তিত্বের জন্য প্রমাণ স্বরূপ করেছেন এবং স্বীয় সৃষ্টির সৃষ্ট হওয়াকে স্বীয় অনাদিত্বের প্রমাণ স্বরূপ করেছেন।'

হযরত ইমাম আলী (আ.) তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে সৃষ্টিকুলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হচ্ছে তাদের সৃষ্ট হওয়া। আর তিনি তাদের সৃষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর অনাদিত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে তিনি সৃষ্ট হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী নন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা – যিনি সকল কিছুর সৃষ্টি হওয়ার কারণ, তিনি সৃষ্ট হতে পারেন না।

হযরত ইমাম আলী (আ.) এ প্রসঙ্গে আরো এরশাদ করেন :

الذى لا يحول و لا يزول و لا يجوز عليه الأفول لم يلد فيكون مولوداً و لم يولد فيصير محدوداً.[৪]

'(তিনি এমন এক সত্তা) যিনি পরিবর্তিত হন না, বিলুপ্ত হন না এবং হারিয়ে যান না; তিনি জন্ম দেন নি যে, তাঁর কোনো সন্তান থাকবে এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি যে, তিনি সসীম হবেন।'

সুতরাং এ বিশ্বজগতের সৃষ্ট হওয়া থেকে নিষ্পন্ন অকাট্য প্রমাণকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি :

বিশ্বজগতের সব কিছু হচ্ছে সৃষ্ট, আর যে কোনো সৃষ্ট অস্তিত্বই কোনো না কোনো স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। সুতরাং এ বিশ্বজগতের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। আর যেহেতু সৃষ্টিকারী কারণের ক্ষেত্রে চক্র[৫] এবং অনাদি ও অনন্ত ধারাবাহিকতা অসম্ভব সেহেতু আদি স্রষ্টা সৃষ্ট হতে পারেন না। সুতরাং নিরঙ্কুশ স্রষ্টা বা আদি স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা।

এক : সৃষ্টিত্বের অকাট্য প্রমাণের ব্যাখ্যা

এ অকাট্য প্রমাণের বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে সৃষ্টিত্ব (حدوث)-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো। কোনো কিছুর অতীতে অস্তিত্বহীন থাকাকে সৃষ্টিত্ব বলা হয়,

আর এর বিপরীতে রয়েছে অনাদিত্ব (قِدم) যার মানে হচ্ছে তার অতীতে কখনো অস্তিত্বহীন না থাকা।

এখানে উল্লেখ্য যে, অনস্তিত্বকে কালগত অনস্তিত্ব ও সত্তাগত অনস্তিত্ব এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

কালগত অনস্তিত্বের মানে হচ্ছে একটি জিনিস – যা আছে – এক সময় তার অস্তিত্ব ছিলো না। এ ধরনের জিনিসের অস্তিত্ব লাভ কে কালগত সৃষ্টিত্ব বলা হয়। অর্থাৎ এমন কিছু অস্তিত্বলাভ করেছে অতীতে যার অস্তিত্ব ছিলো না। এ ধরনের সৃষ্টিত্ব অর্থাৎ কালগত সৃষ্টিত্বের বিপরীতে রয়েছে কালগত প্রাচীনত্ব অর্থাৎ যা অতীতে কখনোই অস্তিত্বহীন ছিলো না, যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম সৃষ্টি।[৬]

অন্যদিকে সত্তাগত অনস্তিত্বের বিপরীতে সৃষ্টিত্বকে সত্তাগত সৃষ্টিত্ব বলবো। এর মানে হচ্ছে কোনো জিনিস সত্তাগত দিক থেকে অতীতে অস্তিত্বহীন ছিলো, যেমন ঃ সমস্ত সম্ভব সত্তা; কারণ, সত্তাগত ও প্রকৃতিগত দিক থেকে এগুলো অতীতে অস্তিত্বহীন ছিলো এবং এগুলোর সত্তার বহির্ভূত কারণের মাধ্যমে এগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর সত্তাগত সৃষ্টিত্বের সাথে সম্ভব অস্তিত্ব হওয়ার বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত।[৭]

অতএব, সৃষ্টিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিত্বের অকাট্য প্রমাণ দুই ধরনের :

ক. সৃষ্টিত্বের অকাট্য প্রমাণ (কালগত সৃষ্টিত্ব)

যে জিনিস অনস্তিত্বমান অতীতের অধিকারী তাকে অস্তিত্ব লাভ করতে হলে তা দু'টি প্রক্রিয়ার কোনো একটির মাধ্যমে লাভ করতে হবে, তা হচ্ছে : হয় তার নিজেকেই নিজের অস্তিত্ব লাভের কারণ হতে হবে, নয়তো অন্য কোনো অস্তিত্ব তাকে অস্তিত্ব দান করবে। সে জিনিসটি যদি নিজেই নিজের অস্তিত্ব লাভের কারণ হতে চায় তাহলে তা হবে স্ববিরোধিতা। কারণ, যেহেতু সেটি কারণ সেহেতু সেটিকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্ববর্তী হতে হবে এবং যেহেতু সে কারণ থেকে উদ্ভূত ফলশ্রুতি অর্থাৎ আগে তার অস্তিত্ব ছিলো না ও পরে সে অস্তিত্ব লাভ করতে চায় সেহেতু সেটিকে কারণ-এর

পরবর্তী হতে হবে। অর্থাৎ কোনো জিনিস তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বে থাকবে, আবার একই সাথে তা তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বে থাকবে না – এটা একটা স্ববিরোধী ধারণা।

অন্যদিকে অন্য কোনো অস্তিত্ব যদি কোনো সৃষ্ট জিনিসের অস্তিত্ব লাভের কারণ হয়ে থাকে এবং এ কারণটিও কালাধীন সৃষ্ট অস্তিত্ব হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় তার জন্যও সেই একই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে প্রশ্ন তার দ্বারা সৃষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেগেছে। এভাবে পিছনে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য এমন এক অস্তিত্বের কাছে উপনীত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই যে অস্তিত্ব কালাধীন অনস্তিত্বশীলতার উর্ধে।

আপনারা যেমন লক্ষ্য করছেন, এ অকাট্য প্রমাণটি কেবল সেই অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কালাধীন অতীত অনস্তিত্বের অধিকারী। অবশ্য কতক মুতাকাল্লিম্ ('ইল্‌মে কালামের বিশেষজ্ঞ) মনে করেন যে, কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই কালোর্ধ সত্তা এবং সমস্ত সৃষ্টিই কালাধীন। ফলে এ অকাট্য প্রমাণ তাঁদের জন্য সমস্যার সমাধানকারী হতে পারে। তবে সর্বপ্রথম সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটি ত্রুটিপূর্ণ এবং সে ক্ষেত্রে এ অকাট্য প্রমাণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, প্রথম সৃষ্টির পূর্বে কাল বলতে কিছু ছিলো না যে বলবো, সেটির তখন অস্তিত্ব ছিলো না। আর আমরা যদি কালকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে গণ্য করি তো সে ক্ষেত্রে সে কাল কোনো কালাধীন অতীত অনস্তিত্বের অধিকারী ছিলো না। অর্থাৎ কালের সূচনার পূর্বে কোনো কাল ছিলো না যে, বলবো এ কাল অতীতে অস্তিত্বহীন ছিলো। অন্যদিকে কাল হচ্ছে গতির পরিমাণ অর্থাৎ কাল গতিশীল জিনিসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ঘনিষ্ঠ অবস্থানের অধিকারী। সুতরাং যখন কোনো জিনিসই নেই তখন কালও নেই। ফলে প্রথম সৃষ্টির পূর্বে কাল ছিলো না।[৮]

আরেকটি সমস্যা এই যে, আমরা যদি অবস্তুগত সৃষ্টির প্রবক্তা হই, যেমন : 'আক্বুল্ ও নাফ্‌স্, সে সব ক্ষেত্রে এ অকাট্য প্রমাণ কার্যকর হবে না।

মোট কথা, যে কোনো দিক থেকে অকাট্য প্রমাণের এ ধরনের উপস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমরা হযরত ইমাম আলী (আ.) কর্তৃক উপস্থাপিত অকাট্য প্রমাণকে এ ধরনের বলে গণ্য করতে পারি না। বরং তিনি যে সৃষ্টিত্বের কথা বলেছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্তাগত অনস্তিত্ব। অতঃপর আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

খ. সৃষ্টিত্বের অকাট্য প্রমাণ (সত্তাগত সৃষ্টিত্ব)

সত্তাগত সৃষ্টিত্বকে অন্য কথায় সম্ভব অস্তিত্ব বলা হয়। বলা চলে যে, সত্তাগত সৃষ্টিত্বের অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে কোনো অস্তিত্বের অপরিহার্য অস্তিত্বের বিপরীতে সম্ভব অস্তিত্ব হওয়া।

আমরা এ অকাট্য প্রমাণটিকে এভাবে উপস্থাপন করতে পারি :

অস্তিত্বের অধিকারী যে কোনো কিছু দু'টি অবস্থার বাইরে নয়; হয় তা সত্তাগত দিক থেকেই অস্তিত্বের অধিকারী অর্থাৎ তা অপরিহার্য অস্তিত্ব, অতএব, তা সর্বাবস্থায়ই অস্তিত্বমান, অথবা তা সত্তাগতভাবে অস্তিত্বের দাবীদার নয় এবং সে ক্ষেত্রে তা সম্ভব অস্তিত্ব। আর যে কোনো সম্ভব অস্তিত্বই অস্তিত্ব লাভের জন্য কারণের মুখাপেক্ষী। কারণ, সম্ভব অস্তিত্ব মাত্রই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের ক্ষেত্রে সমান। এখন কোনো সম্ভব অস্তিত্বের কারণ যদি অপরিহার্য অস্তিত্ব হয়ে থাকে তাহলে সে তার কাছ থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর যদি তার অস্তিত্বের কারণ অন্য কোনো সম্ভব অস্তিত্ব হয়ে থাকে তাহলে তার অস্তিত্বের কারণ হয় ধারাবাহিকভাবে পিছনে যাবে অথবা চক্রাকারে হবে। আর যেহেতু চক্রাকার অবস্থা ও সীমাহীন ধারাবাহিকতা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত সেহেতু তার অস্তিত্বের কারণ শেষ পর্যন্ত অপরিহার্য অস্তিত্বে গিয়ে উপনীত হতে বাধ্য। আর সকলেই অপরিহার্য অস্তিত্বকে রব্ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।[৯]

খাজা নাছীরুদ্দীন তূসী এ অকাট্য প্রমাণটিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

الوجود ان كان واجباً فهو المطلوب و الا استلزمه لاستحالة الدور و التسلسل.[১০]

'অস্তিত্ব যদি অপরিহার্য অস্তিত্ব হয়ে থাকে তো তা তারই অস্তিত্বের দাবী, অন্যথায় (যদি অপরিহার্য অস্তিত্ব না হয়ে থাকে, বরং সম্ভব অস্তিত্ব হয়ে থাকে তাহলে) তার জন্য অপরিহার্য অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত হওয়া অপরিহার্য (কারণ, চক্র ও সীমাহীন ধারাবাহিকতা অসম্ভব)।'

এ অকাট্য প্রমাণের ভিত্তির ব্যাখ্যা

এ অকাট্য প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে অস্তিত্বের অপরিহার্য অস্তিত্ব ও সম্ভব অস্তিত্ব এ দুই ধরনের হওয়া। যে কোনো অস্তিত্বশীল সত্তার অস্তিত্বমানতার বিষয়টি দু'টি অবস্থার বাইরে নয় : হয় তার অস্তিত্বের অস্তিত্বমানতা অপরিহার্য অর্থাৎ কোনো অবস্থায়ই তার অস্তিত্বহীনতা ধারণা করা সম্ভব নয়, সুতরাং সে অস্তিত্ব হচ্ছে অপরিহার্য অস্তিত্ব।

অথবা সংশ্লিষ্ট অস্তিত্বটির অস্তিত্বমানতা অপরিহার্য নয়। অর্থাৎ তার অস্তিত্ব লাভের কারণ যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে তা অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার অস্তিত্ব লাভের কারণ বিদ্যমান না থাকলে তা অস্তিত্বহীন থাকে। এ ধরনের অস্তিত্বকে সম্ভব অস্তিত্ব বলা হয়।

এখন আমরা বাইরের জগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি যেহেতু সেগুলো অস্তিত্ব লাভ করে ও বিলুপ্ত হয়ে যায় সেহেতু সেগুলোর জন্য অস্তিত্বশীলতা ও অনস্তিত্বশীলতা অপরিহার্য নয়। সেগুলোর অস্তিত্ব যদি অপরিহার্য হতো তাহলে সেগুলো আগে ও পরে অস্তিত্বহীন হতো না। আর সেগুলোর অনস্তিত্ব যদি অপরিহার্য হতো তাহলে তা কখনোই অস্তিত্ব লাভ করতো না। সতরাং, যেহেতু বিশ্বজগতের সমস্ত জিনিসের অবস্থা এই যে, সেগুলো অতীতে অস্তিত্বহীন ছিলো এবং পরেও অস্তিত্বহীন হবে সেহেতু বিশ্বজগতের সব কিছুই সম্ভব অস্তিত্ব।

অপরিহার্য অস্তিত্ব ও সম্ভব অস্তিত্বের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য লবণ ও পানির মধ্যকার সম্পর্কের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। লবণ সত্তাগত দিক থেকে নিজেই লোনা; এর লবণাক্ততা কখনোই এর অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু পানি লোনা হতে পারে, আবার লোনা না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় পানি যদি লোনা হয় তাহলে অবশ্যই তার লবণাক্ততা তার বাইরে থেকে তাতে দেয়া হয়েছে। সুতরাং লবণের জন্য লবণাক্ততার বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং পানির জন্য লবণাক্ততার বৈশিষ্ট্য সম্ভব বৈশিষ্ট্য।

দুই : কারণ বিধি

সম্ভব অস্তিত্ব না সত্তাগতভাবে অস্তিত্বমান, না সত্তাগতভাবে অস্তিত্বহীন। অন্য কথায়, সত্তাগত দিক থেকে তার জন্য অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সমান। এমতাবস্থায় তাকে অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হলে তাকে নিজের বাইরের কারো বা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হবে। আর এটা প্রাথমিক পর্যায়ের সুস্পষ্ট বিষয়াদির (بديهيات) অন্যতম। এ ব্যাপারে স্রেফ বিষয়বস্তু (موضوع) ও আরোপিত বিষয় (محمول)-এর ধারণাই যথেষ্ট। অর্থাৎ যে প্রকৃতি (ماهيت)-এর জন্য অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কের বিচারে অস্তিত্বশীলতা ও অস্তিত্বহীনতা সমান তার এ সমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাইরের কারো বা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষিতা অপরিহার্য।

কারণ, এ ধরনের প্রকৃতিকে কোনো কারণ ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করতে হলে অকারণ পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে – যা অসম্ভব। অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো কারণ ছাড়াই নিজে নিজেই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হবে – এটা অসম্ভব। সুতরাং সম্ভব অস্তিত্বের অস্তিত্ব লাভের জন্য তার বাইরে নিহিত কারণের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১১]

অবশ্য অস্তিত্বের মৌলিকত্বের ভিত্তিতে সম্ভব অস্তিত্বকে পরনির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী অস্তিত্ব হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। আর মুখাপেক্ষিতাহীন অস্তিত্ব ব্যতীত মুখাপেক্ষী অস্তিত্বের ধারণা অর্থহীন।

তিন : চক্র ও সীমাহীন ধারাবাহিকতার ভিত্তিহীনতা

কতক দার্শনিক সীমাহীন ধারাবাহিকতার অসম্ভব হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের বা প্রায় সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের অন্যতম হিসবে গণ্য করেছেন, তবে অপর কতক দার্শনিক সীমাহীন ধারাবাহিকতার অসম্ভব হওয়ার সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ সব প্রমাণের মধ্য থেকে একটি প্রমাণ নীচে উল্লেখ করা হলো:

যেহেতু ফলশ্রুতি মাত্রই তার কারণের সাথে সম্পর্কের অধিকারী ও তার মুখাপেক্ষী সেহেতু আমরা যদি সীমাহীন ধারাবাহিকতার অধিকারী কারণসমূহ ও ফলশ্রুতিসমূহের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেই – যে সব কারণের প্রতিটিই অন্য কোনো কারণের ফলশ্রুতি তাহলে অধিকারিত্ব ও মুখাপেক্ষিতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা তৈরী হবে। এটা সুস্পষ্ট যে, মুখাপেক্ষী অস্তিত্ব অমুখাপেক্ষী স্বাধীন অস্তিত্ব ছাড়া – মুখাপেক্ষী অস্তিত্ব যার মুখাপেক্ষী – অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অতএব, এ ধারাবাহিক মুখাপেক্ষিতা ও অধিকারিত্বের পিছনে অবশ্যই একটি অমুখাপেক্ষী স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতে হবে – যার অস্তিত্বের আলোকে সমস্ত মুখাপেক্ষী অস্তিত্ব অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ, সীমাহীন মুখাপেক্ষী অস্তিত্বের সমষ্টি কখনোই অমুখাপেক্ষী ও স্বাধীন হয়ে যেতে পারে না।[১২] এটা হচ্ছে এর সাথে তুলনীয় যে, সীমাহীন শূন্যের সমষ্টি সঠিক সংখ্যা হতে পারে না।

এবার চক্র অসম্ভব হওয়া সম্পর্কে :

এখানে চক্র মানে হচ্ছে এই যে, অস্তিত্বশীল কোনো কিছু নিজেই নিজের অস্তিত্বের কারণ হবে। অর্থাৎ সে নিজে নিজের ওপরই নির্ভরশীল হবে। এর দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজে নিজের অগ্রবর্তী হবে – যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে পরস্পরকে অপসারণকারী দু'টি বিষয়ের একত্রিত অবস্থান। অর্থাৎ একটি অস্তিত্বশীল জিনিস যেহেতু তার নিজের অস্তিত্বের কারণ সেহেতু তাকে তার নিজের অস্তিত্বের অগ্রবর্তী হতে হবে, কিন্তু যেহেতু সে ফলশ্রুতি সেহেতু তার পক্ষে তার নিজের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়, বরং তার জন্য তার নিজের পশ্চাদবর্তী হওয়া অপরিহার্য। আর যেহেতু পরস্পরকে অপসারণকারী দু'টি বিষয়ের একত্রিত অবস্থান অসম্ভব সেহেতু এরূপ ধারণা করা সম্ভব নয় যে, এ বিশ্বজগত নিজেই নিজের অস্তিত্ব লাভের কারণ হবে। বরং এ বিশ্বজগত তার নিজের বহির্ভূত কারণের মুখাপেক্ষী – যে কারণকে আল্লাহ্ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

তথ্যসূত্র

১. নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৮৫; ইহতিজাজ ১/৪৮০/১১৭; আল-তাওহীদ : ৬৯/২৬
২. প্রাগুক্ত
৩. নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৫০;
৪. নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৮৬; বিহারুল আনওয়ার, ৭৭/৩১০/১৪
৫. যে কারণ থেকে কোনো সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে সে কারণ ঐ সৃষ্টি থেকে উদ্ভূত হওয়া, যেমন ঃ পিতা থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান কর্তৃক পিতাকে জন্মদান। – অনুবাদক
৬. এর মানে কিন্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টির অপরিহার্য সত্তা হওয়া নয়। কারণ, অপরিহার্য সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন হচ্ছেন কালোর্ধ সত্তা এবং সৃষ্টিমাত্রই কালাধীন সত্তা। কালের ধারণা সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি ও কালের সূচনা অভিন্ন, সুতরাং সর্বপ্রথম সৃষ্টি আদিতম সৃষ্ট সত্তা, অনাদি সত্তা নয়। – অনুবাদক
৭. হাজ মোল্লা হাদী সাবজাওয়ারী, শারহে মানজুমাহ, পৃ. ৭৯-৮০; আল্লামা তাবাতাবায়ী, নেহায়াতুল হিকমাহ, পৃ. ২০৪
৮. আল্লামা তাবাতাবায়ী, নেহায়াতুল হিকমাহ, পৃ. ১৮৯-১৯১
৯. ইবনে সীনা, ইশারাত ওয়া তাম্বিহাত, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৮
১০. আল্লামা হিল্লি, কাশফুল মুরাদ ফি শারহি তাজরিদিল ই'তিকাদ, পৃ. ২১৭
১১. আল্লামা তাবাতাবায়ী, নেহায়াতুল হিকমাহ, পৃ. ১৩৮
১২. আল্লামা তাবাতাবায়ী, নেহায়াতুল হিকমাহ, পৃ. ১৪৮

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ‘উলুল আম্‌র’

এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ‘উলুল আম্‌র’

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

‘হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর এই রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার ‘উলুল আম্‌র’ এর। এবং যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা দেয় তবে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।’ (সূরা নিসা : ৫৯)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিকে ‘উলুল আম্‌র’ এর আয়াত নামে অভিহিত করা হয়।

‘উলুল আম্‌র শব্দের অর্থ

‘উলু’ (اولو) শব্দের অর্থ অধিকারীরা যার এক বচন অর্থটি বুঝতে (ذو) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১]খলিল ইবনে আহমাদ ফারাহেদী বলেন : (اولو) এবং (اولات) শব্দ

১. যাভী, তারতিবুল কামুসিল মুহিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

দু'টির অর্থ (ذو) ও (ذوات) এর অর্থের (অধিকারীগণ) ন্যায়। এটা বহু বচন অর্থ ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না।[১] (اولو) শব্দটি সব সময় অন্য শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়।

(امر) 'আম্‌র' শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনও আদেশ ও নির্দেশ অর্থে (যার বহুবচন হল 'اوامر') আবার কখনও 'বিষয়, পদ ও দায়িত্ব' অর্থেও (যার যার বহুবচন হল 'امور') আসে। মুফাসসিরদের মধ্যে আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'امر' শব্দটি উল্লিখিত কোন অর্থের প্রতি ঈঙ্গিত করছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাদের এক দল (اولوالامر) শব্দটি শাসক, নেতা ও সেনাপতি অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা মনে করেন এ আয়াতে 'امر'শবাদটি নির্দেশ অর্থ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক দলের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াতে 'اولوالامر' শব্দের অর্থ হল 'পদাধিকারী' ও 'বিশয়ের দায়িত্বশীল' এ অর্থে যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বিচার বিষয়ক, সামরিক বা সামাজিক কোন দায়িত্ব ও পদের অধিকারী হবে সে হল 'اولوالامر'।[২] 'منكم' সম্ভবত 'ظرف مستقر' অর্থাৎ 'عامل' বা কার্যকরী ক্রিয়া হল 'افعال عموم' যেমন 'يكون، كائنٌ، مستقرٌ' অর্থাৎ বিদ্যমান, আছে, রয়েছে তাহলে 'اولى الامر منكم'এর অর্থ হবে 'উলিল আম্‌র' যে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন : 'هو الذى بَعَثَ فى الامّيين رسولا منهم' 'সেই সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' আয়াতটিতে অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 'منكم' তোমাদের মধ্য থেকে অংশটি 'اولوالامر'এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার দলিল হিসেবে এসেছে যা অন্যদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশক অর্থাৎ 'اولوالامر' এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে অন্যদের মধ্যে যা নেই।[৩] 'تَأْويل' শব্দের অর্থ এ শব্দটি 'لا و' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ 'ফিরিয়ে দেয়া' ও 'প্রত্যাবর্তন করানো''। 'تَأْويل شَيْءٍ' অর্থ কোন বস্তুকে তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে দিকে ফিরিয়ে দেয়া। 'تَأْويل الحكم' অর্থ যে প্রকৃত কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে কোন বিধান প্রণীত হয়েছে বিধানকে ঐ কল্যাণ চিন্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো। (অর্থাৎ তার

---

১. ফারাহিদী, তারতিবুল আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

২. আল্লামা তাবাতাবয়ী বলেছেন : যারা বলেছেন 'আয়াতটিতে 'امـر।' শব্দটি আদেশ অর্থে এসেছে যা নির্দেশ শব্দের বিপরীত (এবং বহুবচন হল ا و امـر)' তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাবাতাবায়ী, আল মিজান ফি তাফসিরীল কোরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

আলোকে ব্যাখ্যা করা)। 'أَحْسَنُ تَأْوِيلًا' অর্থ 'সবচেয়ে কল্যাণকর পরিণতি' ও 'প্রকৃষ্টতর পরিণাম'। কারণ এই বিষয়ের দিকেই তার প্রত্যাবর্তন। রাগিব ইসফাহানী বলেছেন : 'أَحْسَنُ تَأْوِيلًا' অর্থ সর্বোত্তম অর্থ ও ব্যাখ্যা।[১] শেখ তুসি ও আল্লামা তাবারসীর মতে কোন বিষয়কে আল্লাহ, রাসূল ও নিষ্পাপ উলিল আমরের নিকট উপস্থাপন করলে তাঁরা সর্বোত্তম সমাধান দান করবেন, কেননা তা অন্যদের দেয়া সমাধান, যার পেছনে কোন দলিল নেই, থেকে উত্তম।[২] কেউ কেউ বলেছেন : 'أَحْسَنُ تَأْوِيلًا' এর অর্থ এটা হল পরিণতিতে তোমাদের আখেরাতের জন্য উত্তম।[৩]তবে এ ধারণা সঠিক নয় যে, এ বাক্যে 'أَحْسَنَ' তুলনামূলক উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বরং আয়াতের সার্বিক ও পূর্ব পর অর্থ বিবেচনা করলে বোঝা যায় এখানে 'উত্তম' বলতে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক কর্মের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। এরূপ না করা ভুল, অন্যায় ও অবৈধ। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ছাড়া অন্য কারো নিকট মতভেদের সমাধান চাওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[৪]

'উলুল আম্‌র' এর আয়াতের তাফসীর

এ আয়াতে 'উলুল আম্‌র' এর আনুগত্যের বিষয়টি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সমপর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সকল বিষয় ও নির্দেশের অধিকর্তা হিসেবে তাঁর আনুগত্য আবশ্যক। আর তাঁর আনুগত্যের অর্থ হল পবিত্র কোরআনের বর্ণিত নির্দেশ পালন এবং এর শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল কোরআনের আয়াতের তাফসীর করেছেন এবং বিধান সমূহের খুটিনাটি বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের শামিল। সুতরাং

---

১. রাগেব ইষফাহানী, মুফরাদাতু আল ফাযিলুল কোরআন, পৃ. ৯৯।
২. দ্রষ্টব্য : আততিবইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭; মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০- ১০১।
৩. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০।
৪. বিশেষ আয়াতে মতভেদের বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপনের সাথে আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাসকে সম্পর্কিত করা হয়েছে যা এ উপস্থাপনের অপরিহার্যতার দলীল। অনুবাদক

রাসূলের আনুগত্য বলতে রাষ্ট্রের শাসক ও নেতা, জনগণের প্রশিক্ষক ও তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসাকারী হিসাবে এবং যে বিষয়গুলোতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিধান প্রণয়নের অনুমতি দিয়েছেন তাতে রাসূল (সা.) এর আনুগত্য বোঝানো হয়েছে।[১]

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যখন রাসূল (সা.) আমাদের মাঝে নেই তখন তাঁর আনুগত্যের অর্থ তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ। তবে যে সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে তা তাঁর সুন্নাত বলে প্রমাণিত হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তার আনুগত্যের বিষয়টি বোঝাতে স্বতন্ত্রভাবে 'أَطِيعُوا' ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন অতঃপর রাসূল ও উলিল আম্‌র এর আনুগত্য নির্দেশ করতে একবার শুধু 'أَطِيعُوا' ব্যবহার করেছেন (اولوالامر এর ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি করেন নি) এবং সম্বন্ধবাচক অব্যয় 'و' (এবং) ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ থেকে রাসূল (সা.)ও 'উলিল আম্‌র' এর আনুগত্যের ধরনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বোঝা যায়। আমরা পবিত্র কোরআনে ১২স্থানে মহান আল্লাহর পাশাপাশি মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের নির্দেশ এসেছে। তন্মধ্যে ১১বার সার্বিকভাবে সকল মুমিনের উদ্দেশ্যে এবং একবার তাঁর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে। সবগুলো ক্ষেত্রেই আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় তা নিঃশর্তভাবে এসেছে। এছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে অনেকস্থানে তাঁর আনুগত্যের আবশ্যকতা, তার সুফল ও অবাধ্যতার কুফল বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের প্রকৃতি নিয়ে আমরা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করি :

১ . আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের শামিল। যেমন বর্ণিত হয়ে ' من يطع الرسول فقد اطاع الله' অর্থাৎ যে এ রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা : ৮০)

২ .নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল তাদের আনুগত্য করা হবে। কোরআন এ বিষয়ে বলেছে : ' من يطع الرسول فقد اطاع الله' আমরা প্রত্যেক রাসূলকে কেবল এই জন্যই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হবে। (সূরা নিসা : ৬৪)

---

১. যেমন পবিত্র কোরআনে কেবল আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত মদ (শরাব) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর অনুমতিক্রমে সকল প্রকার নেশাকর দ্রব্যকে হারাম ঘোষণা করেছেন এখন তা যে কোন উপাদান থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকুক।

৩ . আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য সব সময় শর্তহীন। কখনই তা অন্যদের আনুগত্যের মত বিশেষ অবস্থা ও শর্তের অধীন নয়। কোরআনে যেখানেই আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের কথা এসেছে সেখানেই নিঃশর্তভাবে তাঁর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ শুধু বাহ্যিক ভাবে তাঁর নির্দেশের আসনে আত্মসমার্পন করাকে যথেষ্ট গণ্য করেন নি। বরং আন্তরিকভাবেও তাঁর নির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কেউ তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এ রূপ না হলে তার ঈমানের বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : তোমার প্রভূর শপথ তারা ঈমান আনেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে তাদের দ্বন্দ ও বিবাদের জন্য বিচারক সাব্যস্ত করবে অতঃপর তুমি যা বিচার ফয়সালা করবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন দ্বিধা সংশয় থাকবে এবং তারা পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পন করবে। (সূরা নিসা : ৬৫)

অন্যত্র আল্লাহর বিচারের ন্যায় তাঁর বিচার চূড়ান্ত ও তাঁর অবাধ্যতা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে:'কোন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দান করেন তখন তারা তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে নিঃসন্দেহে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে।' (আহযাব : ৩৬)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত অন্যদের আনুগত্যকে শর্তাধীন করেছেন যেমন : পিতা মাতার আনুগত্যকে শিরকের দিকে আহবান না করার শর্ত যুক্ত করেছেন।[১]

সুতরাং আল্লাহ মুমিনদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ রূপ আনুগত্যকে ঈমানের নিদর্শন বলেছেন এবং কেবল তাঁদের যথার্থ আনুগত্য কারীকেই সফল ও বিজয়ী গণ্য করা হয়েছে।[২] তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]তাঁদের আনুগত্যের উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।[৪] একে 'বেহেশতে প্রবেশ',[১] মহাসাফল্য লাভ',[২] আল্লাহর রহমত[৩] ও আনুগত্য ভাজন হওয়ার উপায় বলা হয়েছে।

---

১. সূরা আনকাবুত : ৮।
২. সূরা নুর : ৫১।
৩. সূরা আনফাল : ২০; সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩।
৪. সূরা নিসা : ১৩।

আলোচ্য আয়াতে 'উলিল আম্‌র' আনুগত্যের বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে এবং তাঁর আনুগত্যের ন্যায় শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, রাসূলের আনুগত্যের সুফল ও তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতার কুফল 'উলিল আম্‌র' এর ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। অর্থাৎ উলিল আমরের আনুগত্যও আল্লাহর আনুগত্যের আন্তর্ভূক্ত, উলিল আমরের আনুগত্য করা হলে নবুওয়াতের মিশন বাস্তবায়িত হবে। মুমিনদের কর্তব্য হল এ আনগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া যাতে করে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের কল্যাণ ও প্রভাব তারা লাভ করতে পারে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের আনুগত্যের সঙ্গে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের কোন পার্থক্য নেই। যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য নির্ভূল ও নিষ্পাপ সত্ত্বার আনুগত্য সেহেতু উলিল আম্‌র এর আনুগত্য তাদের পর্যায়ে হতে হলে তাদের নির্ভূল এ নিষ্পাপ হতে হবে। যদি 'উলিল আম্‌র' মাসুম না হন তবে তাদের আনুগত্য নিঃশর্ত হতে পারে না এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অনুরূপ কল্যাণ তার থেকে অর্জন করা যাবে না। আর বিশেষ ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ তার শামিল হবে না। এ কারণেই উলিল আম্‌র এর আনুগত্য আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্যের ন্যায়। আর যখন রাসূল থাকবেন না তখন যেমন তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য তেমনি যখন মাসুম উলিল আম্‌র আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে থাকবেন না (মৃত্যু বরণ করবেন অথবা অন্তধানে থাকবেন) তখন তাঁদের হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক এক বিষয়। কিন্তু যখন রাসূল অথবা মাসুম উলিল আম্‌র কোন ব্যক্তি দায়িত্ব দিবেন বা কোন পদে অধিষ্ঠিত করবেন তখন সেই ব্যক্তির অনুসরণ বড় ভুল না করা ও বিচ্যুত না হওয়ার শর্তাধীন। মাসুম উলিল আম্‌র সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কাউকে নিয়োগ দিলে (যেমনটি হযরত আলী মালিক আশতারকে নিয়োগ দিয়েছিলেন) অথবা সার্বিকভাবে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির (যথার্থ যোগ্যতার ফকিহগণ) আনুগত্যের নির্দেশ দিলে তাদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার শর্তে তাদের আনুগত্য মাসুম উলিল আম্‌র এর আনুগত্যের শামিল। তবে তারা ভুল ত্রুটির সম্মুখীন হওয়ার কারণে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত। ফলে যখনই তারা ইসলামের বিধান পরিপন্থি কোন আচরণ করবেন অথবা নির্দেশ

১. সূরা ফাতহ : ১৬।
২. সূরা আহযাব : ৭১।
৩. সূরা নুর : ৫৬।

দিবেন পদচ্যুত হবেন। তাই কখনই তারা উক্ত আয়াতের নিঃশর্ত আনুগত্যের অন্তভূক্ত নন। আহলে বাইতের চিন্তা ধারাই উলিল আম্‌র এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিষয়টি তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁরা ধর্ম শিক্ষা এবং কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেমন নির্ভুল তেমনি রাজনৈতিক ও বিচারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও নির্ভূল। কেননা তাঁরা ঐশী দিক নির্দেশনার (কোরআন ও প্রকৃত সুন্নাহর) শতভাগ অনুসারী। তাই তাদের আনুগত্য শর্তহীন। যদি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত উলিল আম্‌র ভুলবশত এমন কথা বলতেন যা আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম অথবা তাঁর কোন হারামকে হালাল করে তবে সেক্ষেত্রে মুমিনরা (মুসলমান সমাজ) আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে শিরক ও অংশীবাদে পতিত হল। তাঁরা যেহেতু কখনও এরূপ ভুল করতে পারেন না সে কারণেই পবিত্র কোরআনে তাঁদের আনুগত্যকে আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্যের মত নিঃশর্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতের বহির্ভূত দলিল

আহলে বাইতের অনুসারীদের দৃষ্টিতে 'উলিল আম্‌র' কারা তা চিহ্নিত করার দ্বিতীয় পথ হল মাসুম ইমামদের বর্ণিত হাদীস। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর রাসূল (সা.) ওহির ব্যাখ্যাদানকারী ও শিক্ষক হিসেবে আলোচ্য আয়াতে যাদের আনুগত্যকে অপরিহার্য করা হয়েছে তাদেরকে উম্মাতের নিকট পরিচিত করিয়েছেন। কারণ আয়াতে 'উলিল আম্‌র' কারা তা উল্লেখ করা হয়নি কেবল তাদের কথাই বলা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় আল্লাহ ও তাঁর নবি (সা.) কি উলিল আম্‌র কারা তা চিহ্নিত ও তাদের দায়িত্বের পরিধি ও বাস্তবায়নের সীমা উম্মতকে বলে না দিয়েই তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন?মহানবী (সা.) কি বলে যান নি এ উলিল আম্‌র এর কর্তৃত্ব বিশেষ এক ভূখণ্ড, জনগোষ্ঠী ও জাতির জন্য সীমাবদ্ধ?না কি আয়াতে যে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনকে অন্তর্ভুক্ত করে?রাসূল কি বলে গেছেন প্রত্যেক ভূখণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র আনুগত্যের অধিকারী ব্যক্তি রয়েছে যাদের সমষ্টিকে উলিল আম্‌র বলে অভিহিত করা হয়েছে?

এখানে কি এ প্রশ্ন থেকে যায় না সাহাবার এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরব ছিলেন, না কি তারা প্রশ্ন করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী চক্র এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর উত্তরকে গোপন করেছে। এটা কি করে সম্ভব যে ব্যক্তিরা 'নতুন চাঁদ,[১] গণিমতের মাল,[২] 'দানের বস্তু'[৩] এমন কি নারীদের ঋতুস্রাবের[৪] মত বিষয়ে নবীর কাছে প্রশ্ন করেছেন অথচ এরূপ (উম্মতের) ভাগ্য নির্ধারক বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন নি? তবে আজ মুসলিম উম্মাহরশতধা বিভক্ত হওয়া এবং ধর্মের বিষয়ে পরস্পর বিরোধী লক্ষ মতের উৎপত্তির পেছনে একক নির্ভূল ব্যাখ্যাকারী কর্তৃপক্ষ ও সঠিক দিক নির্দেশক নেতার অনুপস্থিতিই প্রধান কারণ নয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায় আল্লাহ তাঁর বিধানকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতকেই ব্যাখ্যাহীন অবস্থায় ছেড়ে যান নি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে যে সঠিক বিধান বর্ণনা করেছেন তার খুটিনাটি ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব তাঁর নবির ওপর অর্পণ করেছেন। উলিল আম্‌র এর বিষয়টি এমনই একটি বিষয় যা মহানবী (সা.) তাঁর বাণীতে ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করে ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন :

মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আলী (আ.) এর বেলায়েত (নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব) এর ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে অবতীর্ণ করেন 'নিশ্চয় তোমাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, নামাজ কায়েম করে ও রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়। উলিল আম্‌র এর বেলায়েতকে ফরজ করেছেন কিন্তু তা কি (তারা কারা) কোরআনে বলেন নি বরং আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) কে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের (মুমিন) জন্য বেলায়েতকে ব্যাখ্যা করার যেমন ভাবে তিনি তাদের কাছে নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদির খুটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন।[৫]

উলিল আম্‌র কারা তাদের বিবরণ আহলে বাইতের থেকে বহুল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা গুলির কয়েকটি সহীহ সনদযুক্ত। এ বর্ণনা গুলোর টেক্সট ও ভাবার্থ

১. সূরা বাকারা : ১৮৯।
২. সূরা বাকারা : ২১৫।
৩. সূরা আনফাল : ১।
৪. সূরা বাকারা : ২২২।
৫. হামুয়ী, ফারায়িদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩, হা. ২৫০, বাব ৫৮; ইবনে উকদা, কিতাবুল বিলায়াহ, পৃ. ১৯৮, হাদীস ৩১।

বুদ্ধিবৃত্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। করাণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বার যার নির্ভূলতার কোন নিশ্চয়তা ও প্রমাণ নেই, তিনি তাদের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিতে পারেন না। এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতের বাহ্য অর্থ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। (এ থেকে উলিল আম্‌র এর নির্ভুলতা ও তাঁদের আনুগত্যের বৈধতাও প্রমাণিত হয়।) পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতের অর্থ দ্বারাও এ বিষয়টি সমর্থিত হয় যে, আল্লাহ নিষ্পাপ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিতে পারেন না। আমরা এখানে এ সম্পর্কিত কিছু আয়াতের উল্লেখ করছি :

ক . 'وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَهَوا هُوَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطا'

এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর না যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার প্রবত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ হল বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করা। (সূরা কাহ্‌ফ : ২৮)

এ আয়াতটিতে আল্লাহ যে বিষয়গুলি একজন মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে তা উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, মুমিনরা যেন এমন বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যক্তির আনুগত্য না করে। কোন মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটিও যদি থাকে তবে তার অনুসরণ অবৈধ বলে গণ্য হবে।

খ . 'إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُورا'

'আমরাই তোমার ওপর কোরআন অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হও (তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক) এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপী অথবা অতিশয় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির (কাফের) আনুগত্য কর না।' (সূরা দাহার : ২৩ ও ২৪)

এ আয়াতটিতেও আল্লাহ আনুগত্যের বিষয়টিকে পবিত্র কোরআনের বিধানের ওপর অটল থাকা এবং অকৃতজ্ঞ ও পাপী না হওয়ার শর্তাধীন করেছেন। কোরআনের বিধানের ওপর অটল থাকার পূর্বশর্ত হল এর সকল ও খুটিনাটি বিধানের ওপর পূর্ণ জ্ঞান থাকা ও এ বিষয়ে নির্ভূল হওয়া এবং পাপী না হওয়ার জন্য আবশ্যক শর্ত হল শয়তান ও প্রবৃত্তির তাড়নায় পরোচিত না হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপী অথবা কাফের ছিল আল্লাহ তার আনুগত্যকে স্বীয় আনুগত্যের সমপর্যায়ে স্থান দিতে পারেন না।

উলিল আম্‌র কেবল বিশেষ ব্যক্তিগণ

আহলে বাইতের রেওয়ায়েতে উলিল আম্‌র বলতে কেবল মাসুম ইমামদের বোঝানো হয়েছে। 'আল কাফি' এবং 'তাফসীরে আয়াশী'তে উলিল আমরের ব্যাখ্যায় হজরত বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : এর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে আমাদের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুমিনের জন্য আমাদের আনুগত্যকে অপরিহার্য করা হয়েছে।[১] উলিল আম্‌র এর এ অর্থটি ছাড়া অন্য কোন অর্থ আহলে বাইতের থেকে বর্ণিত হয়নি।

আল্লাহর রাসূল (সা.) ও পবিত্র ইমামদের অসংখ্য রেওয়ায়েতে কখনো উলিল আম্‌র এর নাম আবার কখনো তাদের বৈশিষ্ট্য সার্বিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে যার সবগুলোই বিশেষভাবে আহলে বাইতের মাসুম ইমামদের ওপর আরোপিত হয়েছে। শেখ সাদুক স্বীয় সনদে সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন 'يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...'- আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আমি রাসূল (সা.) কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনি। কিন্তু উলিল আম্‌র কারা যাদের আনুগত্যকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের সাথে সংযুক্ত করেছেন।'

রাসূল (সা.) বললেন : হে জাবির তারা আমার খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত যারা আমার পর মুসলমাদের ইমাম ও নেতা হবে। যাদের প্রথম হল আলী ইবনে আবি তালিব, অতঃপর হাসান, অতঃপর হোসাইন, অতঃপর আলী ইবনে হোসাইন, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী- যে তওরাতে বাকির নামে প্রসিদ্ধ- যার সাতে তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং তুমি তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে। অতঃপর জাফর ইবনে মুহাম্মাদ - আস সাদিক- অতঃপর মুসা ইবনে জাফর, অতঃপর আলী ইবনে মুসা, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, অতঃপর আলী ইবনে মুহাম্মাদ, অতঃপর হাসান ইবনে আলী, অতঃপর মুহাম্মাদ যার কুনিয়া আমার নামে (আবুল কাসেম) যে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রামাণ্য দলীল হবে। সে হল আল্লাহর বান্দা হাসান ইবনে আলী ইবনে

---

১. কুলাইনী, আলকাফী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৭৬, হা. ১; তাফসীরে আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হা. ১৫৪ ও ১৬৯।

মুহাম্মাদের সন্তান। মাহদী বা বাকিয়াতুল্লাহ নামে প্রসিদ্ধ যার মাধ্যমে পূর্ব ও পাশ্চাত্যের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।[১]

অপর এক হাদীসে ইমাম বাকির (আ.) উলির আম্‌র আয়াতটির তাফসীরে উলির আম্‌র যে কোল আহলে বাইতের ইমামগণ তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: 'তাঁরা হলেন ঐ নিষ্পাপ ও পবিতও ব্যক্তিগণ যারা গুনাহ করেন না ও পাপ থেকে মুক্ত...যারা কখনও কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি ও কোরআনও তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি।'[২]

শাফেয়ী মাজহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দীস 'জুয়াইনী'[৩] স্বীয় সনদে খলিফা উসমানের সময়ে হযরত আলী (আ.) কিছু সাহাবীর সামনে নিজের অধিকার প্রমাণে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন- তা একটি দীর্ঘ বর্ণনায় এনেছেন- তাতে উল্লেখ করেছেন :

আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি এ বিষয়টি জানেন না : যখন 'يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ' (সূরা নিসা : ৫৯)

'হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর আল্লাহর রাসূলের ও উলিল আমরের' এবং 'إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون' 'তোমাদের অভিভাবক কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, নামাজ কায়েম করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়।'(সূরা মায়েদা : ৫৫) এবং 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে, এবং কারা আল্লাহ রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বস্তজন (ও গোপন বিষয়ে আমানত দার) হিসেবে গ্রহণ করেনি? (সূরা তওবা : ১৬)

---

১. কামালুদ্দীন , শেখ সাদুক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩, হা. ৩; তুসি, ইলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৭৫।
২. সাদুক, ইলালুশ শারায়ে, ১ম খণ্ড, বাব ১০৩, পৃ. ১২৩-১২৪, হা.১।
৩. জুয়াইনী হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবীর হাদীস শিক্ষক।। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন : জুয়াইনী হাদীসের জ্ঞানে অতুলনীয় ও শেষ্ঠতার অধিকারী ছিলেন। ইসলামের গর্ব সাদরুদ্দীন জুয়াইনী রেওয়ায়েতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। দ্রষ্টব্য : তাযরিকাতুল হুফফাজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫০৫, মাবহাস 'শুউখুস ছাহিবুত তাযকিরা', সংখ্যা (রাকাম) ২৪।

আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় তখন লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করল : 'হে আল্লাহর নবী, 'উলিল আম্‌র', 'রুকু অবস্থায় যাকাত দানকারী' এবং 'মুমিনদের মধ্যে যাকে ব্যতীত বিশ্বস্থজন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তারা কারা?' তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন উলিল আম্‌র ও উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিতে ঠিক যেমনভাবে নামাজ, জাকাত ও হজকে (বিধি বিধান) তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনভাবেই বেলায়েতের (কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব) বিষয়কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল আমাকে গাদীরে খুমে সকলের সামনে মনোনীত করেন (যাতে মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমি এ আয়াতগুলির দৃষ্টান্ত) এবং বলেন : তোমর কি অবগত নও যে, আল্লাহ আমার অভিভাবক এবং আমি মুমিনদের অভিভাবক। আর (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم) আমি (নবি হিসাবে) মুমিনদের নিজেদের থেকে তাদের ওপর বেশী অধিকার রাখি (তারা বলেন : হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল।' তখন তিনি (রাসূল) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে আলী, উঠ। আমি উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন : আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা...।[১]

হাকিম হাসকানী বিশিষ্ট তাবেয়ী মুজাহিদ ইবনে জাফর থেকে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুলের আলোচনায় বলেন : 'أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ' আয়াতটি আমিরুল মুমিনীন আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাঁকে মদীনায় প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। আলী তাঁকে বলেন : (হে আল্লাহর রাসূল,) আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের ওপর আমাকে প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছেন?' রাসূল (সা.) বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তোমার অবস্থান মুসার নিকট হারুনের অবস্থানের ন্যায়...।[২]

---

১. হামূয়ী, ফারায়িদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ.৩১৩, বাব ৫৮, হা.২৫০; হামূয়ী এ হাদিসটি আবান ইবনে আবি আয়াশ সূত্রে সুলাইম ইবনে কাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবান ইবনে আবি আয়াশ থেকে আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাকে কেউ কেউ দুর্বল রাবি বললেও অনেকেই তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (দ্রষ্টব্য: তাহযিবুল কামাল, ২য় খণ্ড, পৃ.১৯-২৪, রাকাম ১৪২)

২. হাসকানী, শাওয়াহেদুত তানযিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২, হাদীস ২০৫, কাজী নুরুল্লাহ শুসতারী (তুসতারী) ও তাঁর 'ইহকাকুল হাক' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে আয়াতটি সম্পর্কে অনুরূপ শানে নজুল বর্ণনা করেছেন; ইহকাকুল হাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫ (আবু বাকর ইবনে মুমিন শিরাজীর 'রিসালাতুল ইতিকাদ' প্রবন্ধ বর্ণিত। ইবনে শাহরে অশুবও

যদিও এ শানে নুযুলটি একজন তাবেয়ী (মুজাহিদ) থেকে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এ বর্ণনাটি সত্য হওয়ার সপক্ষে অনেকগুলো সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে :

১. এ শানে নুযুলটি আয়াতে বর্ণিত নিশর্ত আনুগত্যের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা হযরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) উভয়েই আল্লাহর নবী হিসেবে নিষ্পাপ ও নির্ভুল ছিলেন যারা কখনই সত্যের পরিপন্থী নির্দেশ দিতে পারেন না। আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত আলীকে হযরত হারুন (আ.) এর সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে আলীর নির্ভুলতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থাৎ আলীর আনুগত্য আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত এজন্য যে, তিনিও তাঁর মত নিষ্পাপতার অধিকারী।

২. এ শানে নুযুলটি মুহাদ্দিস জুয়াইনী বর্ণিত হাদীসের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

৩. মহানবী (সা.) এর আহলে বাইতের থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এ মতটিকে সমর্থন করে।

৪. এ শানে নুযুলটি মদীনায় হযরত আলীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিশীল। কারণ তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন মুনাফিকরা এ অপপ্রচার চালায় যে, মহানবী (সা.) আলীর ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় এ যুদ্ধে তাঁকে নিজের সাঙ্গে নেননি।[১] আর এভাবে তারা চেয়েছিল আলীকেও মদীনা থেকে রাসূলের সহগামী হতে বাধ্য করতে যাতে করে মদীনায় বসে ষড়যন্ত্র করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটেই উলিল আমরের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়। এর ফলে মুনাফিকদের পক্ষে আলীর অবাধ্য হওয়ার আর কোন অজুহাত থাকেনি।

৫. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে আহলে সুন্নাতের সূত্রে বর্ণিত পরস্পর বিপরীত বর্ণনাগুলোর মধ্যে কেবল উল্লিখিত শানে নুযুলটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের

'তাফসীরে মুজাহীদ' থেকে উল্লিখিত শানে নজুলটি বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : ইবনে শাহরে অশুব, আল মানাকিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯।

১. দ্রষ্টব্য :ইবনে আবি আছিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৮৭,হা. ১৩৪২ ও ১৩৪৩, মুসনাদে আবু ইয়ালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬, হা. ৭৩৮ (মুসনাদের গবেষক গ্রন্থের পাদটীকায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; নাসায়ী, আল খাসায়িস, পৃ. ৭৬, হাদীস ৪৪।

সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) আয়াতটির দৃষ্টান্ত হিসেবে আলীর নাম উল্লেখ করেছেন এবং আলীর নির্দশাবলী শতভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূরের নির্দেশের অনুবর্তী হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। 'মানযিলাতের হাদীস ছাড়াও অন্যান্য হাদীসে এর সপক্ষে দলীল রয়েছে। যেমন যখন রাসূল (সা.) হযরত আলীকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন কেউ কেউ তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মহানবী (সা.) এর নিকট তাঁর বিরুদ্দে অভিযোগ করলে তিনি (সা.) ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন : ' ما تريدون من عليّ؟ إنّ عليّا منّي و أنا منه، و هو وليّ كلّ مؤمن بعدي'তোমরা আলীর থেকে কি চাও?নিশ্চয় আলী আমার থেকে এবং আমি আলীর থেকে। সে আমার পর সকল মুমিনের নেতা ও অভিভাবক।[১]

এ হাদীসটি মহানবী (সা.) আলীকে নিজের সাথে তুলনা করে তাঁর পর মুমিনদের ওপর তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন যা আলীর কর্ম ও আচরণ ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে ও শরীয়তের সম্পূর্ণ অনুবর্তী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।

৬. এ শানে নুযুলটি হাদীসে সাকালাইনের[২] বিষয় বস্তুর অনুরূপ। কারণ হাদীসে সাকালাইনেও নিঃশর্তভাবে কোরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে

---

১. দ্রষ্টব্য : সুনানুত তিরমিজি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৩, হা. ৩৭১২, ইবনে আবি আছিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৫০, হা. ১১৮৭ (গবেষক মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন :এ হাদীসটির সনদ সহীহ। হাকিম নিশাবুরী ও হাফিজ যাহাবী এর সহীহ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে একমত)। নাসয়ী, খাসায়ীস, পৃ. ৮৮-৮৯ এবং ১২৯-১৩১। এ হাদীসটি আহলে সুন্নাতের গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। খাসায়ীস গ্রন্থের গবেষক কয়েকটি গ্রন্থসূত্রে হাদীসটি উক্ত স্থানে উল্লেখ করেছেন।

২. হাদীসে সাকালাইনের টেক্সট হল : মহানবী (সা.) বলেছেন : 'নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি যা আকড়ে ধরলে তোমরা কখনও বিচ্যুত হবে না : আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর আহলে বাইত। এ দু'টি আমার সাথে (কিয়ামতে) হাউজে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।' সুনানে তিরমিজি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২২, হা. ৩৭৮৬ এবং পৃ.৬৬৩, হা. ৩৭৮৮; মুসতাদরাকে হাকিম নিশাবুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও ১১০; ইবনে আবি আছিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২৯, হা. ১৫৫৩ এবংপৃ. ৬৩০, হাদীস ১৫৫৮; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, হা. ১১১০৪; তাবারানী, আল মোজামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬, হা, ২৬৭৮, ২৬৮০, ২৬৮১ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হা. ৪৯৭১; ইবনে হামিদ, মুসনাদ, পৃ. ১০৭-১০৮, হা. ২৪০ ও অন্যান্য সূত্র দ্রষ্টব্য।

এবং এই দুই ভারী ও মূল্যবান বস্তু বিচ্যুতি থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাদানকারী হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে।

আয়াতে বর্ণিত 'আনুগত্যের অধিকারী' ও আনুগত্যকারী' উল্লিখিত আয়াতে দুইদল ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। প্রথম দল হল যারা আনুগত্য করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় দল যারা আনুগত্য লাভ করবে বা যাদের আনুগত্য অপরিহার্য করা হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় 'আনুগত্যের অধিকারী 'مطاع' ও 'আনুগত্যকারী 'مطيع'। আয়াতে আল্লাহ, রাসূল ও উলিল আম্‌র হলেন আনুগত্যের অধিকারী আর ' يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا' সম্বোধনে যাদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও উলিল আমরের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা হল আনুগত্যের নির্দেশপ্রাপ্ত। এ দৃষ্টিতে এ দু'দল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্বোধিতরা হল রাসূলের আবির্ভাব থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন। তাই কখনই উলিল আম্‌রকে মুমিনদের সাথে মিশ্রিত করা যায় না।

আয়াতে যে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে থেকে 'উলিল আম্‌র' এর অর্থ সূরা জুমুআর 'তোমাদের মধ্যে থেকে একজন উম্মী রাসূলের' ন্যায় অর্থাৎ উলিল আম্‌র এ উম্মতের মধ্যে থেকেই যেমনভাবে রাসূল (সা.) এ উম্মতের মধ্য থেকে। সুতরাং উলিল আম্‌রকে রাসূলের মতই আনুগত্য করতে হবে। কখনই রাসূল ও উলিল আম্‌র এ আয়াতের (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং মহান আল্লাহর পাশাপাশি তারা আনুগত্যের অধিকারী'দের স্থান লাভ করেছেন। পবিত্র কোরআনে কোথাও ভুল-ত্রুটির শিকার হতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে নিঃশর্ত 'আনুগত্যের অধিকারী'দের কাতারে স্থান দেয়া হয়নি।

উলিল আম্‌র নির্ভুল ও নিষ্পাপ এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যক্ষ মনোনীত

আলোচ্য আয়াতে উলিল আমরের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় তারা কখনই ভুল ও পাপ করতে পারেন না। যদি তাদের মধ্যে বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকতো তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের অথবা শিরক বা অন্য কোন পাপে লিপ্ত না হওয়ার শর্তাধীন করে দিতেন যেমনটি পিতা

মাতার আনুগত্যের ক্ষেত্রে করা হয়েছে।[১] এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উলিল আমরের পক্ষ থেকে আল্লাহ নির্দেশের পরিপন্থী কোন নির্দেশ আসতে পারে না। আর এরূপ হওয়া তখনই সম্ভব যখন তারা নিষ্পাপ ও নির্ভুল হবেন।

যখন উলিল আম্‌রকে নির্ভুল ও নিষ্পাপতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে তখন এমন বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিকে মানুষ চিহ্নিত করতে পারে না। কারণ তারা জানে না কোন ব্যক্তি কখনই ভুল সিদ্ধান্ত নেয় না এবং কখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে না। তাই এমন ব্যক্তিদের স্বয়ং আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে করে মানুষ দ্বিধায় পতিত না হয় যে তারা কোন উলিল আমরের আনুগত্য করতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছে।এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা.) বারজন ইমাম, আমীর, খলিফা, ওয়ালী ও নাকিবের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পরিচয় ও আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলে অভিহিত করেছেন।[২]

فَإِنتَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَ ٱلرَّسُولِ -আয়াতাংশের তাফসীর

'যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর।'- এ অংশে মহান আল্লাহ সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সকল মুমিনকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যে কোন বিষয়ে মতভেদ করুক তার সমাধানের জন্য যেন কোরআন ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সুতরাং আয়াতের 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর' অংশে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ এবং হে যারা ঈমান এনছো তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর...' অংশে সম্বোধিতরা একই অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদেরকেই সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা উলিল আম্‌র-এর

---

১. সূরা আনকাবুত : ৮ (যদি তারা দু'জন 'পিতা মাতা' তোমাকে এমন বিষয়ে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই আমার সাথে শিরক করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় তবে তুমি তাদের আনুগত্য কর না।)

২. আলকাফি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯, হা. ৬; তাফসীরে আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হা. ১৫৪ ও পৃ. ৪১৪, হা. ১৭৯। 'যে কেউ ইমাম ব্যতীত মৃত্যু বরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল' হাদীসটি সহীহ সূত্রে মুসনাদে আহমাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪, হা. ৫৩৮৬ এবং ২৮তম খণ্ড, পৃ. ৮৮, হা. ১৬৮৭৬ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নাও।

অন্যভাবে বললে تَنَازَعْتُمْ আয়াতাংশে 'تُم' সর্বনামটি 'يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا' এর অর্থাৎ মুমিনদের দিকেই ইঙ্গিত করছে। তাই কখনই উলিল আমরের সাথে মুমিনদের দ্বন্দ অনুমোদিত নয়। আর তা উলিল আমরের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশের সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

উলিল আম্‌র যদি নির্ভুল না হন তবে সেক্ষেত্রেই কেবল উলিল আমরের সাথে মুমিনদের দ্বন্দ দেখা দিতে পারে। তখন প্রশ্ন দেখা দিবে সকল মুমিনের পক্ষে কি উলিল আমরের কাজ কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা নির্ধারণ করা সম্ভব? যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে বলতে হবে আয়াতের উদ্দেশ্য সকল মুমিন নয়, বরং একদল মুমিন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের অর্থের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কারণ একই আয়াতে পার্থক্যকারী কোন ইঙ্গিত ও নির্দেশক ছাড়াই দুই দলকে সম্বোধন করা উদ্দিষ্ট নিরুপণ করা সম্ভব নয় বিধায় যে কোন ভাষায়ই হোক সঠিক নয়।

উলিল আমরের দায়িত্বের পরিধি

'উলিল আম্‌র' দু'টি সার্বিক দায়িত্বের অধিকারী যার বিভিন্ন শাখা প্রশাখ রয়েছে। তাদের প্রথম দায়িত্ব হল মুসলিমউম্মাহর ধর্মীয় নেতৃত্বদান। এ দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁরা ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা এবং বিধি বিধানকে বর্ণনা করেন। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর দ্বীনের মুখপাত্র হিসেবে মানব গোষ্ঠীর দ্বীন শিক্ষা দান করেন। এ পরিমণ্ডলে তাঁরা যাই বলেন তা কোরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ অনুবর্তী। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁদের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে অন্য কিছুই নয়। উলিল আম্‌র এর দ্বিতীয় যে দায়িত্ব ও পদ রয়েছে তা হল সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দান। যদিও এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা স্থান কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্নরূপ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু কখনই তা ধর্মের সার্বিক যে নীতিমালা কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহর বর্ণিত হয়েছে তার বাইরে

যাননি। এ জন্যই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁদের আনুগত্য আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের শামিল।

অতএব, উলিল আম্‌র আল্লাহর দ্বীনে নতুন করে কোন বিধান প্রণয়ন করেন না এবং কখনই কিয়াস, ইসতিহসান, সংকীর্ণ বুদ্ধি বৃত্তিক ও সামাজিক পার্থিব কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে কিছু বলেন না। বরং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর সার্বিক নির্দেশনার ভিত্তিতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত দান করেছেন।

সূরা নিসার ৫৯ এবং ৮৩ নং আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক

সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াতেও মহান আল্লাহ এ সূরার ৫৯ নং আয়াতের ন্যায় উলিল আমরের উল্লেখ করেছেন তবে এ আয়াতে উলিল আমরের আনুগত্যের বিষয় আসেনি বরং বলা হয়েছে :

'যখন তাদের (মুনাফিক) নিকট নিরাপত্তা অথবা ভয়ের কোন খবর আসে তারা তা প্রচার করে দেয়। (কিন্তু) যদি তারা বিষয়টিকে রাসূল ও উলিল আমরের নিকপ উত্থাপন করত তবে তাদের মধ্যে যারা সত্যকে উদঘাটন করতে পারে তারা অবশ্যই তা জানত (ও প্রকাশ করত)। যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা (সকলেই) অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে।'

যেহেতু আয়াতটি বাস্তবে সংঘটিত একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে সেহেতু অনেক মুফাসসিরই আয়াতকে যুদ্ধের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর আরোপ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে রাসূলের জীবদ্দশায় যে সকল সেনাপতি বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কেউই নিজেকে পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতের দৃষ্টান্ত বলে দাবি করেননি যদিও কোন কোন বর্ণনায় অন্যরা এরূপ দু' এক ব্যক্তিকে উক্ত আয়াতের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীতে হযরত আলী বিভিন্ন সময় নিজেকে এ আয়াতের এবং ৫৯ নং আয়াতের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচয় দান করেছেন। যেমন তিনি মালিক আশতারের প্রতি লিখিত পত্রে বলেছেন :

'আল্লাহর রাসূলের (সা.) নিকট মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য কিছু বিধান ছিল (যা তিনি প্রয়োগ করেছেন) এবং আমার নিকটও তাঁর মৃত্যুর পর জালিম, আমাদের কিবলার অনুসারীও বাহ্যিকভাবে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দানকারী ব্যক্তিদের ওপর প্রযোজ্য বিধান বিদ্যমান ছিল যা আমি তাদের ওপর প্রয়োগ করেছি। আল্লাহ যে সকল মানুষকে (এ সম্পর্কে) নির্দেশনা দিতে পছন্দ করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন : হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আর আনুগত্য কর রাসূল ও উলিল আমরের। আর যখন কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ তবে তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। (সূরা নিসা :৫৯) আল্লাহ আরও বলেছেন : 'যদি তারা তা রাসূল ও উলিল আমরের নিকট উত্থাপন করত তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা সত্যকে উদঘাটনে সক্ষম তারা বিষয়টি জানত।' (সূরা নিসা :৮৩) আর আল্লাহর নিকট উত্থাপনের অর্থ হল তাঁর কিতাবের দ্ব্যর্থহীন বিধানকে গ্রহণ এবং রাসূলের নিকট উত্থাপনের অর্থ তাঁর সর্বস্বীকৃত সুন্নাহর অনুসরণ যা মুসলমানদের একত্রিত করে, বিচ্ছিন্ন করে না। আমরাই হলাম আল্লাহর রাসূলের সেই আহল যারা তাঁর গ্রন্থের দ্ব্যর্থহীন আয়াত থেকে বিধান হস্তগত করি ও মুতাশাবিহ (বিভিন্ন অর্থবাহী) আয়াতকে তা থেকে পৃথক করি এবং আমরাই মানসুখ (বিধান রহিত) আয়াত- যার কঠিন বোঝাকে আল্লাহ (বান্দার থেকে) অপসারণ করেছেন- এবং নাসিখ (বিধান রহিতকারী) আয়াত সম্পর্কে অবহিত।[১]

এ বর্ণনাটিতে হযরত আলী রাসূলের (সা.) আহলে বাইতকে এ দু' আয়াতের উদ্দিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত তিনি দ্বিতীয় আয়াতের বিষয়কে যুদ্ধও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন নি বরং পবিত্র কোরআনের ওপর পূর্ণ জ্ঞান থাকাকে উলিল আমরের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছেন যা মহানবী (সা.) এর আহলে বাইত ভিন্ন অন্য কারো ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না। যেহেতু হযরত আলী এ পত্রটি তাঁর অধীন এক গভর্নর মালিক আশতারের উদ্দেশ্যে লিখেছেন অথচ তাকে এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন নি সেহেতু বোঝা যায় তিনি তাঁর নিযুক্ত শাসন কর্তাদের উলিল আম্‌র মনে করতেন না।

---

১. তোহাফুল উকুল, পৃ. ১২৩ (বাংলায় অনূদিত)।

ইহতিজাজ গ্রন্থেও একটি বর্ণনায় এক ব্যক্তি হযরত আলীকে প্রশ্ন করেন : আল্লাহর হুজ্জাত কারা? তিনি উত্তরে বলেন : তাঁরা হলেন আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর মনোনীত সেই সকল বান্দা যাদেরকে তিনি নিজের ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং স্বীয় আনুগত্যের ন্যায় তাদের আনুগত্যকে ফরজ করেছেন। তারাই হল 'বিষয় সমূহের অধিকর্তা' (أُولِي الْأَمْرِ) যাদের সম্পর্কে বলেছেন : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর আর আনুগত্য কর রাসূল ও উলিল আমরের।' (নিসা : ৫৯) তিনি আরো বলেছেন : যদি তারা রাসূল ও উলিল আমরের নিকট উত্থাপন করত তবে যারা সত্য উদঘাটনে সক্ষম তারা অবশ্যই তা জানত (এবং প্রকাশ করত)।[১]

এ বর্ণনায় উলিল আম্‌র এক মর্যাদাপূর্ণ আসন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পাশে তাদের নাম স্থান পেয়েছে। সুতরাং এটি সাধারণ কোন পদ নয় যে, যে কেউ তা দাবি করতে পারে। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের (মুমিনদের) জন্য ... 'أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ' আয়াতকে তাফসীর করেছেন ও বলেছেন আয়াতটি আলী, হাসান ও হোসাইন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশেষভাবে আলীকে এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন- আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা (নেতা ও অভিভাবক) এবং সার্বিকভাবে আহলে বাইতের ইমামদের উলিল আম্‌র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে) বলেছেন : আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে বিশেষভাবে বলে যাচ্ছি। ... তারা তোমাদের কখনও হেদায়েতের দ্বার থেকে বের করে দিবে না এবং বিচ্যুতির দ্বারে প্রবেশ করাবে না। যদি আল্লাহর রাসূল (সা.) চুপ করে থাকতেন এবং এ আয়াতের উদ্দিষ্ট আহলে বাইতকে পর্চিত না করাতেন তবে অমুক ও অমুকের বংশধররা তা দাবি করত...[২]

এ বর্ণনায় ইমাম সাদিক (আ.) সুস্পষ্টভাবে আহলে বাইতের ইমামগণ ব্যতীত অন্য কেউ উলিল আম্‌র হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশেষতঃ এ উদ্ধৃতি যে আহলে

১. তাবরাসী, আল-ইহতিজাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৮।
২. উসূলে কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬, হা.১; তাফসীরে আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, হা. ১৬৯।

বাইত (উলিল আম্‌র) কখনও সত্যের দ্বার থেকে বের করে দিবে না... তাদের নির্ভুলতার প্রমাণ।

আলেম ও ফকীহগণ উলিল আম্‌র নন

কেউ কেউ মনে করেন আয়াতে বর্ণিত উলিল আম্‌র হলেন ফকীহ আলেমগণ। যেমন হাকিম নিশাবুরী উলিল আম্‌র সম্পর্কে সাহাবা ইবনে আব্বাসের মত এভাবে বর্ণনা করেছেন :

দ্বীন ও ফকীহর জ্ঞানের অধিকারীরা হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুগত্যের অধিকারী। তারা মানুষকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করে এবং তাদের সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। এ জন্য আল্লাহ তাদের আনুগত্যকে ফরজ করেছেন।'

ফকীহ আলেমের আনুগত্যের বিষয়টি তখনই আসে যখন কোন ফকীহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেন অথবা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে কোন নির্দেশ দান করেন। এ আনুগত্যের সপক্ষে অনেক বুদ্ধি বৃত্তিক ও নাকলী (কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক) দলীল থাকলেও আলোচ্য আয়াতটির উলিল আমরের দৃষ্টান্ত হিসেবে তারা এ আনুগত্যের অধিকারী নয়। কেননা প্রথমতঃ আহলে বাইতের হাদীসসমূহে উলিল আম্‌র কেবল বারো ইমামের ওপর আরোপিত হয়েছে। অন্য কাউকে এতে শামিল করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে যেহেতু উলিল আমরের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় নিঃশর্ত সেহেতু ভুল ত্রুটির সম্ভাবনাপূর্ণ কোন ব্যক্তি এরূপ নিঃশর্ত আনুগত্যের অধিকারী হতে পারে না। এ কারণেই আহলে সুন্নাতের মুফাসসিরগণ আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে উলিল আমরের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ অমান্য না করার শর্তাধীন করেছেন যা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের (নিঃশর্ত আনুগত্য) পরিপন্থী। বরং আয়াতে উল্লিখিত উলিল আম্‌র ঐশীভাবে নিষ্পাপতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে এরূপ কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।

তৃতীয়তঃ যদি 'উলিল আম্‌র' এর উদ্দেশ্য ফকীহ ও আলেম হয় তবে আয়াতের এ অংশের 'اِن تَنَازَعْتُمْ' অর্থ হবে যদি ফকীহ ও আলেমরা পরস্পর দ্বন্দ করে তবে তাদের দ্বন্দকে আল্লাহ ও রাসূলের সামনে উপস্থাপন করতে হবে (যাতে তার সমাধান হয়)। তাহলে কি আল্লাহ একই মুহূর্তে ভুল ত্রুটির সমূহ সম্ভাবনাযুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে তাদের মতভেদ সত্ত্বেও নবীর ন্যায় আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন যদিও এতে উম্মত শতধা বিভক্ত হয়? এটা কিভাবে সম্ভব যে, এমন একদল ব্যক্তিকে যারা কখনও সঠিক সিদ্ধান্ত দান করে আবার কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দান করে তা জেনেও নিঃশর্তভাবে তাদের সকলের আনুগত্যের নির্দেশ দিবেন? এটা কি আল্লাহর হেদায়েতের লক্ষ্যের পরিপন্থী নয়?

আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ নিষ্পাপ ইমামদের অনুপস্থিতিতে নিরূপায় হয়ে ফকীহ আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান- যা দ্বিতীয় পর্যায়ের ও বিশেষ অবস্থার এক বিধান (احكام ثانوي)-হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন নি, বরং আয়াতটি প্রথম পর্যায়ের একটি বিধান। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর নবীর আনুগত্য যেমন সকল সময় ও সকল অবস্থায় নিঃশর্তভাবে পালনীয় উলিল আমরের নির্দেশও তেমনি সর্বকালীন ও সর্বজনীন। কারণ কোন অবস্থাতেই তা বিচ্যুতকারী নয় ও দ্বন্দের সৃষ্টি করবে না।এ থেকে প্রমাণিত হয় কখনই উলিল আমরের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে না।

চতুর্থত আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ ও রাসূল অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করলে মতভেদের সমস্যার সমাধান ঘটবে। কিন্তু এখানে কোরআন ও সুন্নাহর থেকে বিধান বের করতে যেয়েই ফকীহদের বোঝার পার্থক্যের কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে কে ও কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে এ ফকীহদের মধ্যে কার মত সঠিক এ বিচার করবে? যদি বলি তারা নিজেরা বসে ঠিক করবেন কার মত সঠিক তাহলে একক ফকিহ নয় বরং ফকিহদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে উলিল আম্‌র বলতে হবে। এমন উলিল আম্‌র এর আনুগত্য অসম্ভব। কেননা মুসলমানদেরশাসন ও বিচার কার্য পরিচালনার ভার যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সার্বিক দিকনির্দেশনা, আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে দ্বন্দের অবসান ঘটানো, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি স্থাপন, প্রধান বিচারপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলোতেসিদ্ধান্ত দানের দায়িত্ব মতভেদের সম্মুখীন অনেক ফকীহর ওপর ন্যস্ত

করলে কখনই একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছা যাবে না। বরং অবশেষে কোন একক বা একদল ফকীহর মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। (বিচার কার্যের ক্ষেত্রে যেমন বিষয়টি এরূপ যে একক বিচারক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করেন।)এখন প্রশ্ন হল কোরআন কি এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ ধরনের ফকীহর সমষ্টির গৃহীত সিদ্ধান্তকে মানারনির্দেশ দিচ্ছে? যদি তাই হয় তবে বলতে হবে কোরআন ও সুন্নাহ নয়, বরং ফকীহদের সামষ্টিক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারীআর তা গ্রহণ করাই হল এ আয়াতের আনুগত্যের অর্থ।কিন্তু এ অর্থটি কখনই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ আয়াত বলছে মতভেদকে আল্লাহ ও রাসূলের কাছে পেশ কর। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর থেকে সঠিক মতটি জেনে নাও। তাই এক্ষেত্রে মতভেদের অবসান ঘটাতে হলে কোরআন ও সুন্নাহর থেকে নির্ভুল মতটি বের করতে হবে যা কেবল নির্ভুল উলিল আম্‌রই নির্ধারণ করতে পারেন, অন্যরা নয়। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য রাসূলের উপস্থিতিতে বিভেদের বিষয়কে রাসূলের কাছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিষ্পাপ উলিল আমরের কাছে উপস্থাপন কর তাহলেই সঠিক মতটি জানতে পারবে।

উলিল আম্‌র সেনাপতি ও শাসকগণ নয়

আয়াতটি নবী বা ইমামের উপস্থিতিতে তাদের মনোনীত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় যেহেতু তাদের আনুগত্যের বিষয়টি নবী বা ইমামের নির্দেশের কারণে অপরিহার্য হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ স্বতন্ত্রভাবে পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন নি। এ ছাড়া নবীর বা ইমামের মনোনীত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যতদিন কোন পদে যেমন সেনাপতি বা শাসক হিসেবে বহাল থাকেন) দায়িত্ব পালন করেন এবং যখন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন তখন তার আনুগত্যের আর কোন নির্দেশ থাকে না। তাই আয়াতের উলিল আম্‌র এমন ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট যাদের থেকে এ পদকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ কারণেই আয়াতের উলিল আমরের পদটি নবীর পদের ন্যায় স্থায়ী একটি পদ এবং তাদের উভয়ের আনুগত্য সর্বজনীনভাবে উম্মতের সকল সদস্য এবং প্রত্যেক মুমিনের ওপর প্রযোজ্য। কখনই যেমন এরূপ হতে পারে না যে, নবীর আনুগত্য একদল মুমিনের ওপর প্রযোজ্য হবে অন্যদের ওপর প্রযোজ্য হবে না। তেমনি উলিল আমরের আনুগত্যও বিভাজ্য নয়

অর্থাৎ তাদের একজনের আনুগত্য একদল মুমিনের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। বরং তাদের সকলের আনুগত্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের ওপর অপরিহার্য। আয়াতের সর্বোজনীন সম্বোধন- (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) হে যারা ঈমান এনেছো- এ সত্যকেই প্রমাণ করে।

সিদ্ধান্ত ও ফলাফল

১. উলিল আমরের আয়াতটি নিঃসন্দেহে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রমাণ করে। নবীর আনুগত্যের সঙ্গে উলিল আমরের আনুগত্য সংযুক্ত হওয়া উভয় আনুগত্য একই ধরনের হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

২. আয়াতের বাহ্যিক অর্থ উলিল আম্‌র বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রযোজ্য হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে বর্ণিত রেওয়ায়েত ও মহানবী (সা.) এর হাদীস এ আয়াতের উলিল আমরের দৃষ্টান্তকে বর্ণনা করেছে।

৩. আয়াতে বর্ণিত নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ উলিল আম্‌র মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়াকে অপরিহার্য করে।

৪. নিষ্পাপ উলিল আম্‌রকে চিহ্নিত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এরূপ বৈশিষ্ট্যের উলিল আম্‌র আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিচিত করানো আবশ্যক বিষয়।

৫. উলিল আম্‌র নির্দিষ্ট না হলে তাদের আনুগত্য মুমিনদের জন্য অসম্ভব হবে। যেহেতু আয়াতের সম্বোধন সর্বজনীন সেহেতু তা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনকে শামিল করে যা কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্পাপ উলিল আম্‌র বিদ্যমান থাকা ও তাদের আনুগত্যের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে।

৬. নবী (সা.) এর আনুগত্য করা যেমন সকল মুমিনের জন্য ফরজ তেমনি উলিল আমরের আনুগত্য করা সকল মুমিনের জন্য ফরজ। এমন হওয়া অসম্ভব যে উলিল আমরের কোন সদস্যের আনুগত্য নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হবে ও অন্যদের ওপর অনবিশ্যক হবে। কারণ আয়াতে বর্ণিত উলিল আমরের আনুগত্যকে আল্লাহ সকল মুমিনের ওপর ফরজ করেছেন।

৭. উলিল আমরের আনুগত্য শুধু ধর্মের ব্যাখ্যা, খুঁটিনাটি বিধান বর্ণনা ও ইসলামের শিক্ষা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, বিচার সংক্রান্ত ও সামরিক নেতৃত্বকেও শামিল করে।

৮. যারা দাবি করে নবী বা কোন ইমামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেনাপতি উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা তাদের অনেকেই রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছেন ও তাদের কাজ থেকে রাসূল নিজেকে সম্পর্কহীন ঘোষণা করেছেন। যেমন উসামা ইবনে যাইদ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। হযরত আলীও যিয়াদ ইবনে আবি ও আশআস ইবনে কাইসের মত লোকদের নিজের শাসনকর্তা মনোনীত করেছেন যাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড তাঁর দ্বারা সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে।

৯. কেউ কেউ ফকিহ আলেমদের আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টান্ত বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তা আয়াতের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশের পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও ফকিহদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকা ও তার মধ্যে কোন মতটি সঠিকতা যাচাইকরা সম্ভব না হওয়ার কারণেগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আয়াত যে কোরআন ও সুন্নাতকে মতভেদ দূর করার কারণ বলেছে সে কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থেকেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা[১]

শহীদ মোর্তাজা মোতাহহারী

প্রথম ভাষণ

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

'দীনে কোনরূপ জোরজবরদস্তি নেই। সঠিক পথ ভুল পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অতঃপর যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে ও আল্লাহয় বিশ্বাস স্থাপন করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভেঙে যাবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।'– সূরা বাকারা : ২৫৬

মানুষের সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা অন্যতম। এর মানে হচ্ছে মানুষকে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ দিকগুলোতে মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে, তার উন্নতি-অগ্রগতি ও গতিবিধির পথে কোন বাধাবিঘ্ন থাকবে না এবং তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। মানুষের যেসব ক্ষমতা বিশেষভাবে সম্মানার্হ এবং স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠার জন্য সে যার খুবই মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষমতা। আপাতত আমরা এ দুটিকে অভিন্ন গণ্য করব (পরে আমরা এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করব।)

প্রকৃতপক্ষে চিন্তা হচ্ছে মানবীয় অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার উন্নতি সাধন অপরিহার্য। আর যেহেতু এর বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নের অনুপস্থিতি

---

১. বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি কার্যত শহীদ মোতাহহারীর দু'টি ভাষণ। ১৯৬৯ সালে তেহরানের হোসাইনিয়ায়ে এরশাদে তিনি ভাষণ দু'টি প্রদান করেন।

অপরিহার্য, সেহেতু মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজন। বর্তমানে বিশেষ করে মানবাধিকার ঘোষণার পর থেকে আমরা আরো দেখতে পাই যে, তথাকথিত চিন্তার স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার ভূমিকায় বলা হয়েছে : '...যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং ভীতি ও অভাব থেকে মুক্ত থাকবে এমন এক বিশ্ব গড়ে তোলাকে সাধারণ গণমানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হিসাবে ঘোষণা করা হলো।'

এখানে বিশ্বাস-এর মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস শামিল রয়েছে। অতএব, মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এমন এক বিশ্ব যেখানে প্রত্যেকেই স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে স্বাধীন, যেখানে প্রত্যেকেরই যে কোন বিশ্বাস পোষণ ও তা অবাধে প্রকাশের অধিকার থাকবে, এমন এক বিশ্ব যেখানে কোনরূপ ভয়ভীতি বা দারিদ্র থাকবে না এবং যেখানে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কল্যাণ থাকবে। এহেন এক বিশ্বকে মানবজাতির জন্য আদর্শ বিশ্বরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণায় ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে : 'প্রত্যেকেরই মত পোষণ ও মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই মত পোষণ এবং দেশ-জাতি নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যম থেকে তথ্য ও চিন্তা সংগ্রহ ও গ্রহণের স্বাধীনতা।'

এখানে আমরা বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাই। তা হচ্ছে, আমাদের দেখতে হবে ইসলাম চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে কিনা। এ পর্যায়ে আমাদেরকে অবশ্যই 'বিশ্বাস' নামে অনেক ক্ষেত্রে যা কিছুকে অভিহিত করা হয় তার ও চিন্তার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। চিন্তা হচ্ছে এমন একটি মানবীয় গুণ যা তার বিচারবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়। যেহেতু মানুষ হচ্ছে বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণী সেহেতু তার চিন্তা করার এবং বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ চিন্তার মাধ্যমে তার সীমিত ক্ষমতার আওতায় সত্য আবিষ্কারে সক্ষম, তা তার যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি অবরোহী ও বাস্তবই হোক, বা সরাসরিই হোক। সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ মানুষকে বিচারক্ষমতা দিয়েছেন যার সাহায্যে সে যুক্তি প্রয়োগ করে থাকে। অর্থাৎ অজানাকে আবিষ্কার করে।

মানুষ জ্ঞানহীনভাবে দুনিয়ার আগমন করে থাকে। যেমন কুরআনে মজিদে এরশাদ হয়েছে :

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বহির্গত করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'– সূরা নাহল : ৭৮

মানুষ জ্ঞানহীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং চিন্তা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে জ্ঞানবান হতে হয়। চিন্তা মানে হচ্ছে ব্যক্তি কোন সমস্যার ব্যাপারে তার যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় এর সমাধান করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম বা অন্য কোন কর্তৃত্বশালী শক্তি কি মানুষকে এ অধিকার প্রদানকে অস্বীকার করতে পারে? না, পারে না। কারণ, এ হচ্ছে এক মানবীয় প্রয়োজন এবং মানবজাতির এক অপরিহার্য প্রয়োজন। ইসলাম চিন্তার অধিকারকে শুধু স্বীকৃতিই দেয়নি; বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, চিন্তা হচ্ছে মানুষের অন্যতম কর্তব্য। ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তা হচ্ছে এক ধরনের ইবাদত।

আমরা যেহেতু শুধু কুরআন অধ্যয়নে অভ্যস্ত এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করি না সেহেতু আমরা অনেক সময় চিন্তা গবেষণার ওপরে কুরআনে মজিদ যে বিরাট জোর দিয়েছে তা অনুধাবনে ব্যর্থ হই। আপনি ধর্মীয় বা পার্থিব বিষয়ে এমন কোন গ্রন্থ পাবেন না যাতে চিন্তা-গবেষণার ওপরে ততখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে যতখানি করেছে কুরআন। কুরআন মজিদ সকল বিষয়ে, যেমন ইতিহাস, সৃষ্টি, স্রষ্টা, নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও নসিহত ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছে। কুরআনে মজিদে এ সংক্রান্ত বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চিন্তাকে ইবাদত গণ্য করা হয়েছে। আপনারা হয়ত হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর এ জাতীয় হাদীস শুনে থাকবেন। তিনি এরশাদ করেন :

تفكر ساعة خير من عبادة سنة

'এক ঘণ্টার চিন্তা-গবেষণা এক বছরের ইবাদতের তুলনায় উত্তম।'

تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة

'এক ঘণ্টার চিন্তা-গবেষণা ষাট বছরের ইবাদতের তুলনায় উত্তম।'

تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة

'এক ঘণ্টার চিন্তা-গবেষণা সত্তর বছরের ইবাদতের তুলনায় উত্তম।'

এসব হাদীসে চিন্তা-গবেষণার মূল্যায়নে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা চিন্তা-গবেষণা ও তার বিষয়বস্তুর স্তরভেদের কারণে বলে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন। কোন কোন ধরনের চিন্তা-গবেষণা মানুষকে এক বছরের ইবাদত পরিমাণ এগিয়ে দেয়। অন্য ধরনের চিন্তা-গবেষণা মানুষকে ষাট বা সত্তর বছরের ইবাদতের সমপরিমাণ এগিয়ে দেয়। আমাদের এক হাদীসে বলা হয়েছে :

كان اكثر عبادة ابي ذر التفكر

'আবু যারের ইবাদতের বেশিরভাগই ছির চিন্তা-গবেষণা।'

মর্যাদার বিচারে হযরত আবু যারকে আমরা হযরত সালমানের পরপরই বা সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করি এবং উভয় সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, মা'সুমগণের পর ঈমানের দিক থেকে এ দুজনের সমপর্যায়ভুক্ত কেউ ছিলেন না এবং এ দু'জনের ন্যায় এত বেশি ইবাদতও কেউ করেননি, কিন্তু তাঁর (আবু যারের) ইবাদতের বেশির ভাগই ছিল চিন্তা-গবেষণা।

এছাড়া বিশ্বাস প্রশ্নে ইসলামের একটি বিশেষ নীতি রয়েছে যা আমাদের ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের মোকাবিলায় বিশেষ স্বতন্ত্রের অধিকারী করেছে। ইসলামে চিন্তা-গবেষণা ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের স্থান নেই। অর্থাৎ ইসলাম যখন কাউকে আল্লাহকে জানা ও একত্ববাদী হবার আহ্বান জানায় তখন ব্যক্তিকে স্বীয় বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে, বিশ্বাসের বিষয়টি হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা, যে সমস্যার সমাধান স্বয়ং ব্যক্তিকেই করতে হবে। ইসলামের এ আবেদন হচ্ছে সেই শিক্ষকের আবেদনের অনুরূপ যিনি তাঁর ছাত্রকে ডেকে বলেন : 'যাও, এ অঙ্কটি নিজে নিজেই কষে আন। তোমাকে এর সমাধানের প্রক্রিয়া জানতে হবে। আমি যদি অঙ্কটি কষে দেই তাহলে তাতে তোমার কোন লাভ হবে না।' ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) হচ্ছে এমন একটি বিষয– যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তোমার নিজেকেই যার সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটিতে বিশ্বাস করি এবং কথাটির অর্থও

বুঝতে পারি– শুধু এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আপনাকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে হবে এবং এর সমাধান করতে হবে।

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ (রুকন)। এও হচ্ছে এমন একটি প্রশ্ন স্বীয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে আপনাকে যার সমাধান করতে হবে। পুনরুত্থান এবং আকায়েদের অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানও আপনাকে এ পন্থায়ই করতে হবে। অবশ্য প্রথম দু'টি প্রশ্নের সমাধান অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে আকায়েদের সমস্যাগুলো যে কোন অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে যুক্তি প্রয়োগের (ইজতিহাদ) মাধ্যমে সমাধান করতে হবে, অন্ধ অনুসরণের (তাকলিদ) মাধ্যমে নয় এবং প্রত্যেককেই যুক্তির আলোকে স্বীয় বিশ্বাসসমূহ পরখ করে নিতে হবে।

এ থেকে এ সত্যটিই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম তার আকায়েদের বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিজাত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানকে শুধু অনুমোদনই করেনি; বরং স্বীয় বিশ্বাসের বিষয়গুলো সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণাকে কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেছে যাতে ব্যক্তি মোটামুটি বুঝতে পারে যে, তার একজন স্রষ্টা আছেন, তিনি এক, তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে তিনি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এসব বিষয়ে ঈমান যদি শুধু মৌখিক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই ঘোষিত হয়ে থাকে তাহলে ইলামের দৃষ্টিতে তা গ্রহণীয় নয়।

এ থেকেই ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ এবং ইসলাম ও অন্যান্য বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে খ্রিস্টবাদের ভূমিকা পুরোপুরিভাবে ইসলামের বিপরীত। খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসকে সব রকমের চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টবাদ থেকে যখন বলা হয় যে, 'এটা হলো বিশ্বাসের রাজ্য, যুক্তিতর্কের নয়' তখন এটাকে একটি ফর্মুলা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস ও যুক্তিতর্কের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের কথা স্বীকার করেন। তারা বলে থাকেন যে, যুক্তিতর্ক ও বিচার বুদ্ধির একটি নিজস্ব কার্যক্রম রয়েছে এবং বিশ্বাস ও আনুগত্যের একটি আলাদা কার্যক্রম রয়েছে; আপনি চাইলে যুক্তিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিতর্ক করার কোন অধিকার আপনার নেই। বিশ্বাসের ক্ষেত্র হচ্ছে আনুগত্যের ক্ষেত্র; এ ব্যাপারে যুক্তিতর্ক করার কোন অধিকার কারো নেই। তিনি

কেবল দেখতে পারবেন এই দুটি অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য কতখানি। এ দুই অবস্থানের একজন মনে করবেন যে, চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব ক্ষেত্র যেন একটি নিষিদ্ধ অঞ্চল এবং অপরজন এটাকে বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য অপরিহার্য শর্ত বানিয়ে সেটাকে কেবল নিষিদ্ধ অঞ্চল নয় বলেই ঘোষণা করবেন না; বরং তাতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করবেন। চিন্তার স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় এটি হচ্ছে তাই।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক এসব বিষয়ে একটি যৌক্তিক অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ রয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকলে যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে তা নিরসনের জন্য অন্যের গোচরে নেয়া এবং জিজ্ঞাসা করা যাবে। মতাদর্শ বিষয়ে প্রশ্ন করা একটি বাধ্যবাধকতা। লোকেরা মহানবী (সা.), হযরত আলী (আ.) ও অন্য ইমামদের কাছে এসব বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করত এবং তাঁরা সেসব প্রশ্নের জবাব দিতেন। আমাদের তর্কশাস্ত্র বিষয়ক এবং অন্যান্য গ্রন্থে মত প্রকাশ এবং প্রশ্ন ও অনুসন্ধান করার ইসলাম স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার ও পরিধি কতখানি তা বিবৃত করা হয়েছে। ইসলাম অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করে। সন্দেহ যত বেশি হবে প্রশ্ন করার মানসিকতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি পরিসমাপ্তি উপনীত হলে তা সত্যের কাছে নিয়ে যাবে।

সেটিই ছিল চিন্তা ও অনুসন্ধানের স্বাধীনতা। বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ধারণাটি কেমন? আকীদা ইতিকাদ থেকে উৎসারিত। আবার ইতিকাদ, আক্‌দ, ইনি'কাদ ইত্যাদি উৎসারিত। যার অর্থ রশি দিয়ে বাঁধা, গেরো দেয়া এবং চুক্তি নিষ্পন্ন করা বা যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কারো হৃদয় দুটি পন্থায় কোন কিছুর সাথে বন্ধনযুক্ত হতে পারে : যুক্তিতর্ক ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা অথবা আবেগ প্রবণতা ও অযৌক্তিক সংশ্লিষ্টতা দ্বারা। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসই অযৌক্তিক সংশ্লিষ্টতার ফল, যুক্তিতর্কের ফল নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি তাদের এই যুক্তিতর্কহীন বিশ্বাস পোষণের ব্যাপারে স্বাধীন? এগুলো হচ্ছে সেই ধরনের আসক্তি যা মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি, স্থবিরতা, উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে এবং যুক্তিতর্কভিত্তিক চিন্তার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়। যখনই কোথাও এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তখন তার প্রথম পরিণতিই হয়

মুক্ত চিন্তার তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া। একটি আরবি প্রবাদে বলা হয়েছে : ‘ কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।’ যখন কোন ব্যক্তি কুসংস্কার দ্বারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়, তখন সে সত্যকে দেখতে পায় না এবং সত্য কথা শুনতেও পায় না। উদাহরণস্বরূপ মূর্তিপূজকদের মূর্তিপূজা। এটি এমন একটি কাজ যা অতীতে হতো এবং এখনও হয়ে থাকে। আমরা কি এটা মনে করতে পারি যে, ঐসব লোকের ঐ বিশ্বাস কোন যুক্তিতর্কভিত্তিক চিন্তাধারার ফল বা মুক্তিবুদ্ধির পরিণতি। অথবা তা বংশ পরম্পরায় চলে আসা কুসংস্কারের ফল যার ভিত্তি নকল অনুকরণ। কেউ কি এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে এবঙ তাকে অবশ্যই মূর্তিপূজা করতে হবে। কারো পক্ষে কি এটি বিশ্বাস করা সম্ভব যে, মানুষ মুক্ত ও যৌক্তিক চিন্তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, গরুকে অবশ্যই পবিত্র গণ্য করতে হবে? আজ পর্যন্ত ভারতের কোটি কোটি মানুষ এমনটিই বিশ্বাস করে থাকে। এও কি হতে পারে যে, একদল মানুষ মুক্ত, স্বাধীন ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, যৌনাঙ্গের পূজা করা অপরিহার্য। অথচ আজকের দিনেও কোটি কোটি মানুষ এমনই বিশ্বাস করে থাকে।

না, কোন মানবীয় বুদ্ধি ও চিন্তা- তা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের হলেও এই ধরনের কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এইসব বিশ্বাসের উৎস ও ভিত্তি অযৌক্তিক। উদাহরণস্বরূপ, এইসব বিশ্বাসের সূচনাকালে কিছু কিছু শোষক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা অন্যদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারা একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল যার জন্য কয়েক প্রকারের বর্ণগত ভিত্তি প্রয়োজন ছিল এবং এই জাতিভেদ প্রথা ছাড়া তাদের ঐ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। এই বিশ্বাসের উদ্গাতা ভালো করেই জানত যে, সে কী করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে জনসাধারণের মধ্যে পুতুল, গাভী, ড্রাগন ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরেছে। আর এভাবেই জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে। প্রথম দিকে তারা এর প্রতি আসক্ত ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলে পর এবং তাদের সন্তানাদি বড় হয়ে পিতা-মাতার ঐসব অভ্যাস প্রত্যক্ষ করে তার অনুকরণ শুরু করে দেয়। পুরুষানুক্রমে এই বিষয়গুলো একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ক্রমেক্রমে তা জাতিগত প্রথা ও রেওয়াজের অংশ হয়ে যায়। এগুলোকে জাতিগত গর্ব ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হতে

থাকে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাকে আর জনজীবন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। এটি হলো একটি আস্তরণের মতো। প্রথম পর্যায়ে যা থাকে মলমের মতো এবং পানিতে মিশিয়ে তা দিয়ে যেমন খুশি তেমনি বানানো যায়। কিন্তু একবার তা শুকিয়ে গেলে পূর্বের চেয়ে অধিক কঠিন হয়ে পড়ে এবং এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে যে গদা বা মুগুরের আঘাতেও তা ভাঙা যায় না।

আমরা এসব বিশ্বাসে বাধা দিব কিনা? আমরা যখন চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলি তখন এই ধরনের বিশ্বাসও কি এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে? এখানেই ভ্রান্তি বিদ্যমান। একদিকে তারা বলছে যে, মানুষ যুক্তিতর্ক ও চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে স্বাধীন; অপরদিকে তারা বলছে যে, বিশ্বাসের ব্যাপারেও অবশ্যই স্বাধীনতা থাকতে হবে। মূর্তিপূজককে যেমন তার বিশ্বাসের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হবে তেমনি গাভী ও ড্রাগনের পূজককেও চিন্তার স্বাধীনতার সাথে বৈপরীত্য ঘটলেও প্রত্যেককে তার পছন্দমতো ইবাদত-বন্দেগি করতে দিতে হবে এবং পছন্দমতো যে কোন বিশ্বাসের চর্চা করতে দিতে হবে।

ইংল্যান্ড একটি মুক্তচিন্তার দেশ বলে তারা তার প্রশংসা করে। দেশটিতে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা রয়েছে। সেখানে তারা ঘোষণা করেছে মূর্তিপূজক মূর্তিপূজা করার ব্যাপারে স্বাধীন এবং গো-পূজক গরুর পূজা করার ব্যাপারে স্বাধীন। তাদের উভয়েরই বিশ্বাসে চর্চা করার স্বাধীনতা রয়েছে, এমনকি এ ব্যাপারে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং তাদের মন্দির দেবদেবীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তাদের মতে এসব করা হয় এজন্য যে, প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়ও এক ধরনের ভুল করা হয়েছে। যে নীতির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে মানুষের মর্যাদা (যে নীতি আমরাও মেনে চলি)। এখানে যুক্তি দেখানো হয় যে, মানুষ যেহেতু শ্রদ্ধাযোগ্য তাই তার বিশ্বাসও শ্রদ্ধাযোগ্য। এটি এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। কেননা, মানুষের পক্ষে এমন একটি বিশ্বাসও বাছাই করা সম্ভব যা তাকে শিকলবন্দি করে ফেলে। কাউকে কি এরূপ করতে স্বাধীনতা দেয়া যায় এবং মানুষের মর্যাদার সাথেই বা কোনটি উপযুক্ত? মানুষকে কি দিক নির্দেশনা দিতে হবে এবং তাকে কোন প্রগতি ও উন্নতির পথ দেখাতে হবে, না তাকে এ কথা বলতে হবে যে, যেহেতু তুমি একজন মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষই শ্রদ্ধাযোগ্য, সেহেতু কোন কিছু পছন্দ বা বাছাই করার ব্যাপারে তুমি স্বাধীন এবং তোমার পছন্দ বা বাছাই

শ্রদ্ধাযোগ্য? যদিও আমি তা ভুল ও মিথ্যা কুসংস্কার লে মনে করে থাকি এবং তার হাজারো রকমের খারাপ পরিণতি আছে। কিন্তু আমি তা মেনে নিচ্ছি এ কারণে যে, তুমি নিজে তা পছন্দ করেছ? সে যা পছন্দ করেছে তাতো যুক্তিতর্ক ও চিন্তা-ভাবনার জন্য এক শিকল ও বন্ধনবিশেষ। এই বন্ধনকে কি করে শ্রদ্ধা করা যায়? এই বন্ধন-শৃঙ্খলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকৃত অর্থে মানুষের ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতি অবমাননা। কেননা, মানুষের মধ্যে তো যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বিদ্যমান। অতএব, একজন সচেতন মানুষের কর্তব্য হলো কাউকে এ জাতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যাতে তার চিন্তাশক্তি মুক্তি লাভ করতে পারে।

ব্রিটেনের রাণী একবার ভারত সফরে এসে কয়েকটি মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন। একটি মন্দিরে প্রবেশের সময় তিনি সচরাচর মন্দিরের যে স্থানে জুতা খুলে রাখা হয় তার আগেই জুতা খুলে রেখে মন্তব্য করেছিলেন : 'এটি একটি মন্দির। অতএব, এই স্থানকে শ্রদ্ধা করতে হবে।' তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক নন। তা সত্ত্বেও তিনি মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এই কারণে যে, তারা কিছু মানুষের শ্রদ্ধার বিষয়কে মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

(ইরানীদের মধ্যে) এমন কতিপয় লোক আছে যারা এই বলে গর্ববোধ করে যে, 'আমরা আড়াই হাজার বছর আগেই মানবাধিকার ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছি। সাইরাস যেদিন বেবিলনে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন তিনি মূর্তিপূজার সকল মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন জরথুস্ত্রের ধর্মের অনুসারী, মূর্তিপূজক নন। তাই আমরা এমন এক জাতি যারা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করেছি।' এটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর একটি অবস্থান। অবশ্য এর মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারণার উদ্দেশ্য সফল হয়। কেননা, কেউ যদি একটি জনগোষ্ঠীকে বশীভূত করতে চায় তাহলে সেই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু সত্যিকার মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পুরোপুরি ভুল।

এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদ্ধতিই সঠিক। একটি স্বাধীন মানসিকতার ধারক হিসাবে তিনি ছিলেন একা। তিনি তাঁর চারপাশের লোকদেরকে দেখেছিলেন যে, তারা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ব্যতিরেকেই একটি অন্তঃসারশূন্য প্রচলিত বিশ্বাসের শিকলে বন্দি। একদিন তাঁর শহরের লোকজন কিছু উৎসকর পালনের জন্য বাইরে চলে গেলে তিনি অসুস্থতার দরুন শহরেই থেকে যান। শহরে যখন কেউই থাকল

না তখন তিনি কুঠার নিয়ে একটি বড় মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেললেন। পরে একটি বড় মূর্তির ঘাড়ে কুঠারটি ঝুলিয়ে রেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এমনকি করার উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র কুরআনের বাণী মোতাবেক মানুষের মনকে মুক্ত করা। রাতের বেলা লোকেরা ফিরে এসে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখল যে, তা যেন একটি কসাইখানা হয়ে গেছে। মন্দিরের গোটা দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেখানকার মূর্তিগুলো সেখানকার একমাত্র রক্ষাকর্তা বড় মূর্তির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

'এসব কে করেছে'? তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। কেননা, তাদের জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তি তাদের বলে দিল যে, এসব নিষ্প্রাণ মূর্তি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই এটি সচেতন কোন লোকের কাজ। তাদের কেউ কেউ বলল : 'ইবরাহীম নামের এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি। সম্ভবত সে এই কাজ করেছে।' তারা জিজ্ঞাসাবাাদের জন্য ইবরাহীম (আ.)- কে এনে হাজির করল। তারা ইবরাহীম (আ.)- কে বলল : ' হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ?' ইবরাহীম জবাব দিলেন : 'না, এদের মধ্যে যে প্রধান সেই তো এ কাজ করেছে। এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি এরা কথা বলতে পারে।' তিনি বুঝাতে চাইলেন, ' তোমরা দেখ, যে অস্ত্র দিয়ে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা বড় মূর্তিটিই বহন করছে। কেন তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করছ? অবস্থার শিকার যারা তাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর তারাই তোমাদেরকে বলতে পারবে।' এতে তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা নিয়ে একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল। এই কাজের মাধ্যমে ইবরাহীম (আ.) তাদের মস্তক অবনত করালেন এবং বিশ্বাসের বন্দিদশা থেকে তাদের মনকে মুক্ত করলেন। এই ধরনের কাজ একটি মানবীয় মূল্যবোধের কাজ।

ইমরানের পুত্র মূসা (আ.)-এর কাজও ছিল এমন একটি মানবীয় মূল্যবোধেরই কাজ। হযরত মূসা (আ.) যখন দেখলেন যে, তাঁর সমাজের লোকেরা মূর্তির মতোই সামেরীর সোনার বাছুরের পূজা করছে, তখন তিনি ঘোষণা করেন : 'আমরা নিশ্চয়ই এ জ্বালিয়ে দিব এবং এর ছাই সমুদ্রে ছড়িয়ে দিব।' যেসব ইসরাইলী গরুর বাছুরের পূজা করত তারা মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ফর হিসাবে করত না। একবার সমুদ্র অতিক্রম করার পর তারা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছল যে, মূর্তির সামনে

সেজদাবনত হয়ে আছে- এর আগে তারা এমন আর কখনও দেখেনি। তারা এতে খুবই কৌতুহলবোধ করে এর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে মূসা (আ.)- কে বলে : ' হে মূসা! তাদের যেমন খোদা আছে, তেমনি আমাদের জন্য একজন খোদা বানিয়ে দাও।'

এ ব্যাপারে নবীরা যে পদ্ধতির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সেটাই সঠিক। তাঁরা মানুষকে মুক্ত মনের অধিকারী করার জন্য বছরের পর বছর ধরে মূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। আরবের পৌত্তলিকতা যদি আরো হাজার বছর টিকে থাকত, তাহলে আরবরা তাদের মূর্তিপূজা অব্যাহত রাখত (ঠিক অনুরূপভাবেই অব্যাহত রাখত যেমন জাপানের মতো পৃথিবীর কোন কোন উন্নত দেশে আজও মূর্তিপূজা বর্তমান রয়েছে) এবং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির দিকে এক কদমও এগুতে পারত না। মহানবী (সা.) আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে সে বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে রেহাই দিয়ে মানসিকভাবে মুক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : ... 'সে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে যা তাদের ওপর ছিল।' (সূরা আরাফ : ১৫৭) ইউরোপীয়রা যে জিনিসটিকে একজনের অধিকার বলে সংরক্ষণের কথা বলছে পবিত্র কুরআনে তাকে বন্দিত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুসংস্কারের বোঝা থেকে রেহাই দিয়েছেন এবং বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

বদর যুদ্ধের পর মহানবী (সা.)-এর সামনে যুদ্ধবন্দিদের হাজির করা হলো। এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মহানবী (সা.) তাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখলেন। তখন তাঁর চেহারায় একটু প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটে উঠল। এতে বন্দিরা বলল : 'আমাদের দুর্দিনে আপনি আনন্দিত হচ্ছেন, আপনার কাছ থেকে আমরা এমনটি আশা করি না।' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'আমি তোমাদের দুরবস্থা দেখে আনন্দিত হচ্ছি না। আমি এজন্য আনন্দ বোধ করছি যে, আমি তোমাদেরকে একটি পরম সুখের স্থানে নিয়ে যেতে তোমাদেরকে এই শৃঙ্খল পরিয়েছি এবং তোমাদেরকে মিথ্যা বিশ্বাসের কবল থেকে মুক্তি দিতেই আমি তোমাদেরকে বন্দি করেছি।'

চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদি কোন বিশ্বাস চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ইসলাম তা গ্রহণ করে, অন্যথায় ইসলাম তা গ্রহণ করে না। ইসলাম সেই বিশ্বাসকেই অনুমোদন করে যার

উৎপত্তি চিন্তার স্বাধীনতা থেকে। অনুকরণ ও রসম-রেওয়াজভিত্তিক বিশ্বাস এবং যে বিশ্বাস অজ্ঞতা, চিন্তা-বিবেচনাহীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার নামে অযৌক্তিক ধারণাভিত্তিক আনুগত্য থেকে উৎসারিত সে বিশ্বাসকে ইসলাম কখনোই মেনে নেয় না।

আজকের দুনিয়ায়, বিশেষত ইউরোপে বিরাজমান বিশ্বাসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত এ চরম দৃষ্টিভঙ্গি অংশত ইতিহাসের ভয়াবহ দলন-পীড়নেরই প্রতিক্রিয়া, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সংঘটিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি সরকারী ধর্মমতের বিপরীত কোন মত পোষণ করছে কিনা এক সময় গীর্জাগুলো তা তদন্ত করে দেখত, এমনকি তা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কিছু হলেও। উদাহরণস্বরূপ, গীর্জা যদি মনে করে যে, মৌলিক উপাদান হলো চারটি এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তাহলে তা করে এই বিবেচনায় যে, এটা আবিষ্কার করা না করা একমাত্র গীর্জারই কাজ। এমনকি এ সংক্রান্ত ভিন্ন কোন মত অধিকতর যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত হলেও ভিন্ন মত পোষণকারীদেরকে শাস্তিযোগ্য মনে করে। গীর্জা এসব দুস্কৃতিকারীদের (?) ধরে এনে বিচার করে এবং খুঁটিতে বেঁধে আগুন দিয়ে পোড়ানোর মতো কঠিন শাস্তি প্রদান করে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করে দেখা যাবে যে, প্রাচ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিষ্ঠুরতার বিষয়ে কেউ কেউ প্রাচ্যের ইতিহাসকে যেভাবেই আখ্যায়িত করুক এবং বক্তারা উমাইয়া ও আব্বাসীদের, বিশেষত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চারিত্রিক কলংক আলোচনা করতে যতই চেষ্টা করুক না কেন মধ্যযুগ বা সাম্প্রতিককালের ইউরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় তা সামান্যই। ঐ যুগে মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার। আলবার্ট মালেট তাঁর মধ্যযুগ সংক্রান্ত ইতিহাসে লিখেছেন, সামান্য অপরাধে একজন মহিলাকে কিভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে! বহু পণ্ডিতকে মত প্রকাশের দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, তাও আবার সেসব মত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ছিল না। ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান বিষয়ে।

এই অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচারের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই ঘোষিত হয়েছিল ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপাওে মানুষের স্বাধীনতার কথা, এমনকি তা যদি গাভী পূজাও হয়ে থাকে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতার এই মতবাদের আরেকটি কারণ হলো, ইউরোপীয় দার্শনিকরা মনে করেন, খোদার ইবাদত, পুতুল পূজা বা গাভী পূজা নির্বিশেষে যাই হোক না কেন, ধর্ম ও বিশ্বাসের বিষয়টি ব্যক্তির বিবেক-বিবেচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিরই তার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য এক ধরনের দিকদর্শন প্রয়োজন, যাকে বলা হয় ধর্ম। তাঁরা অন্তত এতটুকু স্বীকার করেন যে, ধর্মের সাথে কোন না কোন পর্যায়ের নিবিষ্টচিত্ততা ছাড়া মানুষ কিছু করতে পারে না। শিল্পকলা ও কবিতা সম্পর্কেও তাঁরা একই কথা বলেছেন- আর এই বিষয়গুলো পুরোপুরি অন্তর্মুখী– ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং ভুল-নির্ভুলের মানদণ্ড এখানে বিচার্য নয়। এখানে ভালো ও মন্দ ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভরশীল। যেমন কোন ব্যক্তি সে খাদ্যই গ্রহণ করে যা সে পছন্দ করে এবং সে রংয়েরই পোশাক পরে যা সে পছন্দ করে। ব্যক্তিগত রচি ও পছন্দের বিষয়গুলোতে নিরঙ্কুশ ভালো ও নিরঙ্কুশ মন্দ বলে কিছু নেই।

তাঁরা ধর্ম ও নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন বস্তুনিষ্ঠতা আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা এটাও মানেন না যে, মানুষকে একটি সুখকর পথে চলার দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ কর্তৃক নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, ধর্মের প্রকৃত অনুভূতি এবং তার মূল সূত্র আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা সর্বতোভাবে যা জানি তা হলো যে, ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না এবং সে কারণে তার জীবনের জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ ধরনের তন্ময়তা বা নিবিষ্টচিত্ততা, যাকে ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তা সে এক খোদার ইবাদত অথবা যিশু খ্রিস্টের মতো কোন মানুষের বা কোন গাভী বা কোন ধাতব বা কাঠের মূর্তির পূজা যাই হোক না কেন। আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চাই না। প্রত্যেকেই তার নিজের জন্য যা ভালো মনে করে তা সে পছন্দ করে থাকে।

আমাদের আপত্তি ঠিক এখানেই। ধর্মের ব্যাপারে আমরা এই মতকে সঠিক মনে করি না। তাঁদের ঘোষণা মতো যে ধর্মের বিশ্বাস একটি স্বাধীন পছন্দের ব্যাপার, আমাদের মতে সত্যিকার অর্থে তা কোন ধর্মই নয়। আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি মানবীয় আনন্দের একটি পথ হিসাবে এবং তার একটি বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা এটা বলতে পারি না যে, মানবীয় আনন্দের বস্তুনিষ্ঠ পথ সংক্রান্ত কোন বিশ্বাস একেবারে মুক্ত হতে পারে। এমনকি তা যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাচর্চার উপর ভিত্তিশীল না-ও হয়ে

থাকে। আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনি কি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত বিষয়ে বিশ্বাসের স্বাধীনতার অনুমতি দেবেন? ধরুন, একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা চোখ ফোলা রোগ চায় এবং তাদের শতকরা ৯০ ভাগ লোকের তা হয়েও গেল। আপনি কি সেই রোগ সারাতে তাদের অনুমতি প্রার্থনা করবেন? আপনি কি কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তথা সকল উপায় অবলম্বন করে তাদের এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবেন না এবং ঘোষণা করবেন না যে, এলাকাবাসী পছন্দ করুক আর নাই করুক তিনি তাদের সেবা করবেন?

ধরুন, সেখানে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। আপনি তাদের জন্যে একটি স্কুল খুলবেন, কিন্তু তারা এর বিরোধিতা করতে থাকল এবং স্কুলটি বন্ধ করে দিতে চাইল। আপনি কি চিন্তা করেন না যে, তাদের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য? তাহলে কেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মানবীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন বলে নিন্দা করা হয় না? অপরদিকে একই ঘোষণার ২৬ অনুচ্ছেদে মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কি মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে? না। কেন? কেননা, এই বিষয়টি মানবকল্যাণের সাথে জড়িত। যারা অজ্ঞানতা ও অশিক্ষায় নিমজ্জিত থাকে তারা তা বুঝতে পারে না। তাদেরকে শিক্ষিত করতে শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হলে তা করতেই হবে এবং তাদেরকে এই সেবা দিতে হলে প্রয়োজনমতো দমনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

অবশ্য ধর্মের ব্যাপারে তারা অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে না। কেননা, তারা মনে করেন যে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটি বৈষয়িক বাস্তবতা রয়েছে এবং এর উপর মানুষের কল্যাণ নির্ভরশীল, কিন্তু ধর্ম আধ্যাত্মিকতার সাথে জড়িত একটি ব্যক্তিগত বিষয়, যে কোনভাবে সে প্রয়োজন পূরণ করলেই হয়। তাঁরা বলেন, মানুষ ভক্তি বা পূজা ও ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে একটি অভ্যন্তরীণ তাগিদ অনুভব করে, সে ইবাদতের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন? সে কারণেই তাঁরা বলেন, বিশ্বাসকে শ্রদ্ধাই করতে হবে এবং বিশ্বাস ও চিন্তার মধ্যে পার্থক্য করা চলবে না।

এখানে দু'টি দিক রয়েছে, প্রথমত ধর্মকে শুধু পোশাকের রং বাছাইয়ের মতো ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের একটি আধ্যাত্মিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং দ্বিতীয়ত পোশাকের রং বাছাই থেকে ধর্মের বিষয়ে বাছাই ভিন্নতর অর্থাৎ মানুষ

যদি একটি অযৌক্তিক বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে সেই বিশ্বাস তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারার স্বাধীন কর্মতৎপরতায়ও বাধা সৃষ্টি করে।

উপরে আমরা যা আলোচনা করেছি তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামে বিশ্বাসের স্বাধীনতার সাথে সাথে চিন্তার স্বাধীনতাও রয়েছে, কিন্তু তা যথাযথ যুক্তিভিত্তিক হতে হবে। যৌক্তিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন বিশ্বাস পোষণের স্বাধীনতা ইসলামে নেই। কেননা, এই ধরনের স্বাধীনতা মানুষকে দাসত্ব ও বন্দিত্বের মধ্যে নিপতিত করে। তাই মহানবী (সা.) এই ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলেন এবং মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেটাই ছিল সঠিক পদ্ধতি।

ইসলাম একদিকে মূর্তিপূজাকে মারাত্মকভাবে প্রতিরোধ করে আবার অন্যদিকে মূর্তিপূজককে বলে যে, তার খোদা বিশ্বাসের যে অবস্থা, যা মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। খোদা বিশ্বাস অবশ্যই হতে হবে একটি স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে :

وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ ٢٠ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١

'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?'– সূরা যারিয়াত : ২০-২১

ইসলাম চিন্তা-ভাবনাহীন খোদা বিশ্বাসকে মান্য করে না। সে মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকে অর্থাৎ গাছপালা, পশুপাখি, নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব, শরীর ও আত্মা এবং আকাশমণ্ডলী নিয়ে গবেষণা করার আহ্বান জানায়। খোদার একত্বে বিশ্বাসের উপর চিন্তা-গবেষণা বা পর্যালোচনার উপর ইসলাম এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, মানুষ খোদার একত্ব, নবুওয়াত ও কিয়ামতের জ্ঞান অর্জন করার উপায় হিসাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে বাধ্য হয়।

إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ

فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'– সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯১

এই পবিত্র আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাদি রয়েছে। আয়াতটিতে লোকদের প্রতি এসব নিদর্শন নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে, তবে যারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল তারাই এ ধরনের চিন্তা-গবেষণা করতে পারে। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।' (সূরা বাকারা : ২)। এর অর্থ এই যে, ধর্ম ও বিশ্বাস কোন শাসন বা জোর-জুলুমের বিষয় নয়। এর পথ খুব পরিষ্কার। এর সবকিছুতে প্রয়োজন চিন্তা-ভাবনা ও সচেতনতা। মোটকথা, ইসলাম যে ধরনের বিশ্বাস চায়, তা জোর করে অর্জন কিংবা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ইসলাম যে ধরনের বিশ্বাস প্রত্যাশা করে তাতে জোর-জবরদস্তির কোন অবকাশ নেই এবং কাউকে জোর করে সেই ধরনের ঈমান পোষণ করানো সম্ভব নয়। একটি শিশুকে প্রহার করলে বা তার উপর চাপাচাপি করলেই কি সে পাটি গণিতের একটি অংক সমাধান করে ফেলতে পারবে? না, তার মন-মানসিকতা ও চিন্তাশক্তিকে অবশ্যই স্বাধীন করে দিতে হবে যাতে সে অংকটি সমাধান করার সুযোগ পায়। ইসলামের ঈমান বা বিশ্বাসও অনেকটা এই ধরনের।

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের শানে নযুল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারগণ, বিশেষত আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তাদের শিশুদেরকে ইহুদিদের কাছে পাঠাত। মদীনার মুশরিকদের তুলনায় ইহুদিরা ছিল সভ্য। আর মুশরিকদের মধ্যে মাত্র দশ থেকে বিশজনের মতো লিখতে ও পড়তে পারত। এই শিশুদেরকে ইহুদিদের কাছে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো। এর ফলে ঐ শিশুরা ইহুদিদের এবং নিজেদের পরিবার ও গোত্রের কৃষ্টি-

সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে শিখে এবং এক সময় ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। মদীনায় যখন ইসলামের আর্বিভাব ঘটে তখন মুশরিকরা মুসলমান হয়; কিন্তু অধিকাংশ ইহুদি তাদের পথই অনুসরণ করতে থাকে। যারা ইহুদিদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তাদেরও কেউ কেউ ইহুদি গোত্র বনু নাজিরকে যখন চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয় তখন ইহুদিদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণকারী আনসারদের ছেলেমেয়েরাও তাদের সাথে যেতে চাইল। তাদের পিতা-মাতারা তাদের থামাতে চেষ্টা করে এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে। বিষয়টি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট নেয়া হলো তখন তিনি তাদের উপর জোর-জবরদস্তি না করার কথা বললেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার কর্তব্য হলো ছেলে-মেয়েদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরা এবং তা গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া। মহানবী (সা.) তাদেরকে পবিত্র কুরআনের এই বাণীটি পাঠ করে বললেন, বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হেদায়াত লাভের পথ ভ্রান্তপথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। যদি কেউ এই হেদায়াতের পথ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা হবে তার আত্মার অসুস্থতার লক্ষণ।

ইসলাম সব সময়ই স্বৈরশাসনের ভিত্তি মিথ্যা বিশ্বাসকে প্রতিরোধ করে এসেছে। ইরানে ইসলাম একটি দুর্নীতিপরায়ণ শাসকচক্রকে উৎখাত করে মানুষকে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা দেয় এবং ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানায়। এটাই ইতিহাস। পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে অধিকাংশই ইরানী ছিল অগ্নিপূজক। ইরানে আরব শাসনের পর যখন পারসিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইরানীরা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা আরব শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং আরবরাও তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি।

(প্রথম ভাষণ সমাপ্ত)

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

ব্যক্তিত্ব

ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.)

ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.)

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন (আ.) ৩৮ হিজরির ৫ শাবান বৃহস্পতিবার পবিত্র মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ শুভ সংবাদ হযরত আলী (আ.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করেন। তিনি এই নবজাতকের নাম রাখেন 'আলী'। পরবর্তীকালে ইবাদত-বন্দেগির কারণে তাঁর প্রকৃত নামের পাশাপাশি সকলের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন দু'টি মহান উপাধি দ্বারা। একটি হলো 'যায়নুল আবেদীন' (ইবাদতকারীদের সৌন্দর্য) আর অপরটি হলো 'সাইয়্যেদুস সাজেদীন' (সিজদাকারীদের নেতা)। ইসলামের এই মহান ব্যক্তিই হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের ধারার চতুর্থ ইমাম; পরবর্তী ইমামগণ তাঁরই বংশধারায় এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছেন। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কুনিয়াত বা ডাক নাম হলো আবু মুহাম্মাদ।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) শৈশবের প্রথম কয়েক বছর অতিবাহিত করেন পিতামহ আলী ইবনে আবু তালিবের স্নেহক্রোড়ে এবং পরবর্তীকালে চাচা ইমাম হাসান ও পিতা ইমাম হুসাইনের কাছে লালিত-পালিত হন । তাঁদের কাছ থেকেই তিনি লাভ করেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা নিয়েই নিজেকে তিনি গড়ে তোলেন মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদিত একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসাবে।

শৈশব থেকেই তিনি আহলে বাইতের ও তাঁদের অনুসারীদের ওপর বনু উমাইয়্যার অত্যাচার-নির্যাতন প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং নবী পরিবারের সদস্য হিসাবে তিনি নিজেও এই নিপীড়ন সহ্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর মধ্যেই ৫০ হিজরিতে ইমাম

হাসান (আ.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ব্যথাও তাঁকে বহন করতে হয়। এরপর কেটে যায় আরো দশটি বছর। অবশেষে ৬১ হিজরির কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা যেন তাঁর ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসাবে দেখা দেয়।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার সময় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি তাঁর পিতা ইমাম হুসাইন (আ.), চাচা হযরত আব্বাস (আ.), তাঁর ভাই হযরত আলী আকবার ও আলী আসগারসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং ইমামবংশের অনুসারীদের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করেন। অসুস্থতার কারণে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সেই কারণে নিহত হওয়া থেকে রেহাই পান।

শাহাদাতের আগে ইমাম হুসাইন (আ.) শেষ বারের মতো যখন নিজ তাঁবুতে পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসেন তখনও হযরত যায়নুল আবেদীন রোগশয্যায় শায়িত। এই অবস্থাতেই ইমাম হুসাইন তাঁর এই পুত্রকে পরবর্তী ইমাম হিসাবে স্থলাভিষিক্ত করে যান।

কারবালার ঘটনার পর ইয়াযীদের বর্বর বাহিনীর হাতে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) লাঞ্ছনার শিকার ও বন্দি হন। নারীদের সাথে তাঁকেও বন্দি করে দামেশকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ইয়াযীদের রাজপ্রাসাদে হযরত যায়নাব (আ.) ও হযরত যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে ইয়াযীদ তাঁদেরকে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

মদীনায় ফিরেও ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) চরম নির্যাতনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। তাঁর চলাফেরার ওপর আরোপ করা হয় কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং কোন ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। ইমাম যায়নুল আবেদীনকে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'আমাদের অবস্থা ফিরআউন বংশীয়দের মাঝে বনু ইসরাইলের ন্যায়– তারা তাদের শিশুদের হত্যা করত এবং তাদের নারীদের ছেড়ে দিত।'

উমাইয়্যা গভর্নর আহলে বাইতের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল লোকদেরকে সবসময় হুমকির মধ্যে রাখত। তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালাত। আহলে বাইতের প্রতি অনুরক্ত

হওয়ার কারণে লোকদেরকে বন্দি করা হতো এবং তাদের অনেককে হত্যা করা হতো।

অন্যদিকে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কিছুদিন নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। নিভৃতে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন, দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল থাকতেন আর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্মরণে সবসময় চোখের পানি ফেলতেন। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর নিভৃতে অবস্থান করার পেছনে কিছু কারণও ছিল। যেমন :

১. ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নন– এটি শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠা করা। ইয়াযীদের অনুচররা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল এবং তারা সব সময় ইমামের সাথে দেখা করতে আসা লোকদের প্রতি নজরদারি করত। আর এটাও যাচাই করত যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে কোনরকম গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কিনা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা ইমাম কর্তৃক এমন কোন কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজে পায় নি।

২. নিভৃতে অবস্থান ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে তিনি ইয়াযীদ ও বনু উমাইয়্যাকে এ ধারণা দেন যে, বর্তমান অবস্থায় রাজনীতির বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ নেই।

৩. উম্মতের সামনে মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে আদর্শ উপস্থাপন।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর আন্দোলন

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার পর ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। বনু উমাইয়্যা ও তাদের অনুসারীরা মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইমাম হুসাইন ও আহলে বাইতের মর্যাদা এবং ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অবগত ছিল। তাই তারা ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল যাতে যে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা এড়াতে পারে, বিশেষ করে তাদের প্রধান অবস্থান সিরিয়ায়। তারা ইমাম হুসাইনকে একজন বৈধ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসাবে দেখাতে প্রয়াস পায়। যদি ইমাম যায়নুল

আবেদীন (আ.) এর বিরোধিতা না করেই ছেড়ে দিতেন তাহলে উমাইয়্যাদের অপপ্রচারটাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। আর তাই ইমাম যায়নুল আবেদীন প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের কারণ স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। হযরত যায়নাব, হযরত উম্মে কুলসুমও বনু উমাইয়্যার কুৎসিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করে দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

বন্দি অবস্থায় সিরিয়ায় উপনীত হলে এক বৃদ্ধ তাঁদের পরাজয় ও ইয়াযীদের বিজয় লাভের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বৃদ্ধ বলে : 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফিতনাকে নিভিয়ে দিয়েছেন।' কিন্তু ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) সেই বৃদ্ধের কথা শুনে তাকে বললেন : 'আমি তোমার কথাগুলো শুনেছি। আমার প্রতি তোমার অন্তরে যতটুকু শত্রুতা ও ঘৃণা ছিল তার পরিচয় দিয়েছ। আমি যেরূপ শান্তভাবে তোমার কথাগুলো শুনেছি তুমিও তদ্রূপ আমার কথাগুলো শোন।' বৃদ্ধ লোকটি শুনতে রাজি হলে ইমাম বললেন : 'কুরআন পড়েছ কি?' বৃদ্ধ বলল : 'পড়েছি।' ইমাম যায়নুল আবেদীন বললেন : এই আয়াত পড়েছ কি :

قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ

...(হে রাসূল!) তুমি বলে দাও, 'আমি এর (বার্তা প্রচারের) জন্য তোমাদের নিকট হতে আমার পরমাত্মীয়গণের প্রতি সৌহার্দ্র ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না'...[২]

বৃদ্ধ বলল : 'হ্যাঁ, পড়েছি।' ইমাম বললেন : 'আমরাই রাসূল (সা.)-এর পরিবার। এই আয়াতটি পড়েছ কি?

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ ...

'এবং পরমাত্মীয়... প্রাপ্য প্রদান কর...'[৩]

বৃদ্ধ বলল : 'হ্যাঁ পড়েছি।' ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) বললেন : 'আমরাই সেই পরিবার। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে যাদের অধিকার দিতে বলেছেন। বৃদ্ধ বলল : 'সত্যিই কি তোমরা তারা?' ইমাম বললেন : 'হ্যাঁ, তুমি খুমসের আয়াত পড়েছ কি?

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ...

'এবং জেনে রাখ যে, যা কিছু তোমরা গনীমত থেকে লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ কেবল আল্লাহর জন্য এবং (এই) রাসূলের জন্য এবং (রাসূলের) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম (পিতৃহীন), দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত...'[৪]

বৃদ্ধ বলল : 'হ্যাঁ, পড়েছি।' ইমাম সাজ্জাদ বললেন : 'তাতহীরের আয়াত পড়েছ কি?

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ﴿٣٣﴾

'আল্লাহ কেবল চান যে, হে আহলে বাইত! তোমাদের হতে সর্ব প্রকারের কলুষ দূরে রাখতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে।'[৫]

বৃদ্ধ লোকটি তার হাতদুটি আকাশের দিকে উঁচু করে তিনবার বলল : 'হে আল্লাহ! তওবা করছি। তোমার নবী ও তাঁর পরিবারের সাথে শত্রুতার জন্য তওবা করছি। আর তাঁদের হত্যা করায় আমি অসন্তুষ্ট। আমি এর আগেও কুরআন পড়েছিলাম, কিন্তু এই সত্যকে জানতাম না।'[৬]

এভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে আহলে বাইত তথা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন। একইভাবে ইয়াযীদের দরবারে ও সিরিয়ার মসজিদেও তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং এতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন : 'হে জনতা! আমাদেরকে ছয়টি গুণ ও সাতটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) : জ্ঞান, সহনশীলতা, উদারতা, বাগ্মিতা, সাহস ও বিশ্বাসীদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালোবাসা- যা আমাদের মাঝে উপস্থিত। আর আমাদের মর্যাদাগুলো হলো যে, যে রাসূল দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে; সত্যবাদী (ইমাম আলী) আমাদের মাঝ থেকে; যিনি ওড়েন (জাফর তাইয়ার) তিনি আমাদের মাঝ থেকে, আল্লাহর সিংহ (হযরত হামযা) এবং তাঁর রাসূলেরও- আমাদের মাঝ থেকে; আর উম্মতের দুই সিব্‌ত (ইমাম হাসান ও হুসাইন) আমাদের মাঝ থেকে। যারা আমাকে জানে তারাতে আমাকে জানেই; যারা আমাকে চেনে না, আমি তাদের জন্য আমার বংশধারা ও পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রকাশ করছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে চিনতে পারে। হে জনতা! আমি মক্কা ও মিনার সন্তান, আমি

যমযম ও সাফার সন্তান। আমি তার সন্তান যিনি কালো পাথরকে (হাজরে আসওয়াদ) তুলেছিলেন তাঁর কম্বলের প্রান্ত ধরে।... আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি কাবা তাওয়াফ করেছেন, সাঈ করেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি হজ করেছেন এবং তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন। আমি তাঁর সন্তান যাঁকে রাতের বেলা মসজিদুল আকসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (মেরাজের সময়), আমি তাঁর সন্তান যাঁকে সিদরাতুল মানতাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল...। আমি তাঁর সন্তান যাঁকে সর্বশক্তিমান ওহী দান করেছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি হুসাইনের সন্তান যাঁকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে; আমি আলীর সন্তান, যিনি মুর্তাযা (অনুমোদনপ্রাপ্ত), আমি মুহাম্মাদের সন্তান যাঁকে বাছাই করা হয়েছিল; আমি ফাতেমাতুয যাহরার সন্তান, আমি সিদরাতুল মুনতাহার সন্তান, আমি শাজারাতুল মুবারাকাহ (বরকতময় গাছের) সন্তান, আমি তাঁর সন্তান যাঁর শোকে রাতের অন্ধকারে জিনরা বিলাপ করেছিল, আমি তাঁর সন্তান যাঁর জন্য পাখিরা শোক পালন করেছিল।'[৭]

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁর আন্দোলন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। তিনি এক্ষেত্রে যেসব কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন :** ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) মদীনার মসজিদে নববী ও তাঁর ঘরকে জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁর নিকট আগত লোকদেরকে তিনি সত্যিকার ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন।

২. **জাল হাদীস ও জাহেলি রীতির পুনঃপ্রচলন রোধ :** তিনি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.) এবং আলী (আ.)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত মহানবী (সা.)-এর সহীহ হাদীসগুলো প্রচার করতেন। বনু উমাইয়্যা যেসব জাহেলী রীতির পুনঃপ্রচলন ঘটাতে চাচ্ছিল সেগুলোকে তিনি প্রকাশ করে দেন।

৩. **কারবালার ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা :** যেহেতু কারবালার ঘটনা ছিল ইয়াযীদ ও বনু উমাইয়্যার চরিত্র উন্মোচনকারী, অত্যাচারীদের মোকাবিলায় দাঁড়ানোর ভিত্তি এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবন, আর এটাই ছিল ইসলামী চরিত্রের

মানদণ্ড সেহেতু ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কারবালার ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতেন।

৪. **ইমাম হোসাইনের স্মরণকে জাগরুক রাখা :** নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ইমাম যায়নুল আবেদীন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্মরণকে জাগরুক রাখেন :

ক. **ক্রন্দন করা :** ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের স্মরণ ও তাঁদের জন্য ক্রন্দন করার মাধ্যমে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) মানুষের স্মৃতিতে ইমাম হুসাইনকে জাগরুক রাখেন। তিনি মানুষের মনে ইমাম হোসাইনের জন্য বেদনাবোধ সৃষ্টি করতেন এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর বাড়ির সন্নিকটে একটি জায়গাকে বেছে নেন ইমাম হুসাইনকে স্মরণ করার জন্য।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কারবালার স্মরণে প্রতিনিয়ত ক্রন্দন করতেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। যখন তিনি খাবার খেতেন ও পানি পান করতেন তখন কাঁদতেন। নানা উপলক্ষেও। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তিনি ক্রন্দন করতেন। যখনই মুহররম মাস আসত ইমামের চেহারায় বিষাদের ছায়া আরো ঘনীভূত হতো। যখন তিনি দেখতেন, কোন কসাই পশুকে জবাইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, সেটাকে পানি খাওয়ানো হয়েছে কিনা। কসাই ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বলতেন : 'কিন্তু আমার পিতাকে, আমার পরিবার-পরিজনকে পানি না দিয়ে পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে।' এরপর তিনি ভীষণভাবে ক্রন্দন করতেন।

ইবনে আসাকির তাঁর সূত্রে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হলো : 'কেন আপনি ইমাম হুসাইনের জন্য এত অধিক কান্নাকাটি করেন?' তিনি জবাবে বলেন : 'আমাকে এজন্য সমালোচনা কর না। কারণ, ইয়াকুব (আ.) তাঁর এক সন্তান নিখোঁজ হওয়াতে এতটা ক্রন্দন করেন যে, তাঁর চোখ সাদা হয়ে যায়। অথচ তিনি জানতেন তাঁর সন্তান জীবিত আছেন। আর আমি আমার চোখের সামনে আমার পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যকে জবেহ করে হত্যা করতে দেখেছি। তোমরা কি এ চরম দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে চাও?'[৮]

তবে তিনি এজন্যও কাঁদতেন যেন মুসলমানদের মধ্যে ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। লোকজনও তাঁর সাথে ক্রন্দন করে তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করত এবং ইয়াযীদ ও বনু উমাইয়্যার নিষ্ঠুরতাকে স্মরণ করত। আর এভাবে ইমাম হোসাইনের স্মরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত দ্বীনকে ফিরে পাওয়া ও আনুগত্যের আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। ইমাম যায়নুল আবেদীন সারা জীবন কারবালার শোকে ক্রন্দন করেছিলেন। আর তাঁর সাথে ক্রন্দনকারীদের সংখ্যাও দিনে দিনে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খ. **কারবালায় যিয়ারত :** ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) প্রতি বছর কারবালায় যেতেন। তিনি সকলকে কারবালায় যিয়ারত করার জন্য আহ্বান জানাতেন। সফরের জন্য সময় বের করা, সফরের কষ্ট সহ্য করা এবং অর্থ ও শারীরিক শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন হতো। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে কারবালার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করতে চাইতেন।

গ. **আশুরার দিবস পালন :** ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) প্রতি বছর আশুরার দিবস পালনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি লোকদেরকে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও বক্তব্য শোনার জন্য উৎসাহিত করতেন যাতে তারা আশুরার ঘটনাকে স্মরণ করে ইসলামের পথে যে কোন প্রকার ত্যাগের জন্য নিজেদেরকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতে পারে।

৫. **সর্বসাধারণের সাথে সংযোগ স্থাপন :** পূর্ববর্তী ইমামগণের ন্যায় ইমাম যায়নুল আবেদীন ও উম্মাহর প্রতি ভীষণভাবে মনোযোগী ছিলেন। তাদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে তিনি তাঁদের নিকট একজন দয়ার্দ্র পিতা, একজন জ্ঞানী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন যিনি উম্মাহর দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাকের (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আস-সাজ্জাদ মদীনার ১০০টি দরিদ্র পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনাথ, অভাবী, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ব্যক্তি এবং যাদের কোন সহায় নেই এমন ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াতেন। তিনি নিজেই তাদের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। যাদের স্ত্রী-পরিজন ছিল তারাও ইমামের কাছ থেকে খাবার পেত। শারীরিকভাবে দুর্বল প্রতিবেশীদের জন্য তিনি রাতের বেলা পানি বহন করে আনতেন এবং ক্রীতদাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন।

৬. **ইমামতের ব্যাখ্যা :** ইমামত ও ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি এবং ঐশীভাবে মনোনীত হিসাবে ইসলাম ধর্মে তাঁদের আবশ্যকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতেন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)। যেমন একটি দোয়ায় তিনি বলেন : 'হে প্রভু! তোমার আহলে বাইতের ওপর রহমত বর্ষণ কর, যাদেরকে তুমি তোমার (পথে) কর্ম সম্পাদনের জন্য পছন্দ করেছ এবং তাদেরকে তোমার জ্ঞানের সংরক্ষক ও তোমার ধর্মের অভিভাবক করেছ; পৃথিবীর বুকে তোমার খলিফা নিযুক্ত করেছ এবং তোমার জান্নাত লাভের পথ করেছ।'[৯]

উমাইয়্যাদের প্রতিক্রিয়া ও ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর শাহাদাত

উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আহলে বাইতের অনুসারীদের দমন-পীড়নের চিন্তা করতে থাকে। এজন্য সে কুখ্যাত হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কুফার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করে। সে কুফায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, কঠোর হস্তে আহলে বাইতের অনুসারীদের দমন করে, সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনেক লোককে সে হত্যা করে।

ইমাম বাকের (আ.) বলেন : 'তারপর আগমন ঘটে হাজ্জাজের। সে তাদেরকে (আহলে বাইতের অনুসারীদের) নৃশংস পন্থায় হত্যা করত। বিন্দুমাত্র সন্দেহের বশে সে তাদেরকে নির্যাতন করত। অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, কোন ব্যক্তি হযরত আলীর অনুসারী হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেয়ার চেয়ে নাস্তিক অথবা কাফির বলে পরিচয় দেয়াকে নিজের জন্য উত্তম বলে মনে করত।'

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হাজ্জাজ ৯৫ হিজরিতে ইরাকের ওয়াসিত নামক স্থানে মারা যায়। সে ১২০০০০ মুসলমানকে হত্যা করেছিল, ৫০০০০ পুরুষ ও ৩০০০০ নারীকে বন্দি করেছিল। সে পুরুষ ও নারী বন্দিদেরকে একটি জায়গায় বন্দি করে রাখত।

ইমামগণের উপস্থিতিকে বনু উমাইয়্যা নিজেদের জন্য হুমকি হিসাবে মনে করত। তারা এজন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত যে, ইমামগণের প্রভাবে একদিন জনগণ তাঁদের নেতৃত্বে সংগঠিত হবে এবং বনু উমাইয়্যার শাসনক্ষমতার পতন ঘটাবে।

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার পুত্র ওয়ালিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। সে ইমাম যয়নুল আবেদীনের সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে ইমামকে কেবল ভয়-ভীতি দেখিয়ে এ কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। তখন সে ইমামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের ফলেই অবশেষে পঁয়ত্রিশ বছর পবিত্র ইমামতের দায়িত্ব পালনের পর চতুর্থ ইমাম হযরত যায়নুল আবেদীন (আ.) ৯৫ হিজরিতে (৭১২ খ্রিস্টাব্দে) শাহাদাত বরণ করেন। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করে। মদীনার জান্নাতুল বাকী করবস্থানে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে সমাহিত করা হয়।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মুসলিম লেখকগণ প্রতিভা, জ্ঞান এবং ধার্মিকতার জন্য ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম যুহরী বলেন : 'আমি এই (মহানবীর) পরিবারের মধ্য থেকে আলী ইবনুল হোসাইনের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও প্রতিভাবান কোন ব্যক্তিকে দেখার সুযোগ পাইনি।'

ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ' গ্রন্থে বলেন : 'যায়নুল আবেদীন হলেন এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর পিতার জ্ঞান, দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদত উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিলেন।'

ইবাদত-বন্দেগি : ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর পিতার শাহাদাতের পর প্রায় ৩৪ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র জীবনকাল নিবেদিতচিত্তে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও শহীদ পিতার স্মরণের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি অধিক পরিমাণ সময় নামায পড়তেন ও সেজদারত থাকতেন বিধায় 'সাজ্জাদ' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

ইমাম বাকের (আ.) বলেন : কখনই তিনি সিজদা করা ছাড়া মহান আল্লাহর প্রশংসা করতেন না। কখনই তিনি সিজদা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের সিজদা সংক্রান্ত কোন আয়াত তেলাওয়াত করতেন না। যখনই দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিতেন

তখনই সিজদা করতেন। তাঁর কপালে সিজদার স্থানে সিজদার চি... পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হতো। আর এজন্যই তাঁকে বলা হতো 'আস-সাজ্জাদ'।

ইমাম যায়নুল আবেদীন আল্লাহ তাআলার প্রতি এত বেশি মনোযোগী থাকতেন যে, নামাযের প্রস্তুতির জন্য ওজু করার সময়ই তাঁর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত এবং নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপতে থাকত। কেন এমন হয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : 'তোমরা কি জান, নামাযে আমি কার সামনে দাঁড়াই এবং কার সাথে কথা বলি?'

ইমাম বাকের (আ.) আরো বলেন : আলী ইবনুল হুসাইন (আ.) এমনভাবে নামাযে দাঁড়াতেন যেভাবে এক-অদ্বিতীয়, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে একজন বিনম্র দাস দাঁড়ায়। সর্বশক্তিমান ও প্রশংসিত আল্লাহর ভয়ে তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাঁপতে থাকত। তিনি এমন ইবাদতকারীর ন্যায় নামায পড়তেন যে আরেকবার তা করতে সক্ষম কিনা নিশ্চিত নয়।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) সম্পর্কে একজন কুরাইশ যুবকের জিজ্ঞাসার জবাবে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : 'আলী ইবনুল হুসাইন হলেন ইবাদতকারীদের নেতা।'

ইমাম মালিক বলেন : "অবিরত ইবাদতে নিমগ্ন থাকার কারণেই তাঁকে 'যায়নুল আবেদীন' বলা হতো।"

দানশীলতা : ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর দানশীলতা ছিল অসাধারণ। তিনি গোপনে দান করতেই ভালোবাসতেন। তাঁর শাহাদাতের পর জনশ্রুতি ছিল যে, ইমাম সাজ্জাদের ইন্তেকালের পর গোপন দানেরও অবসান হয়েছে। পিতামহ ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর মতোই ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গরীব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং নিজের পিঠে করে আটার বস্তা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতেন। তিনি মদীনার প্রায় একশ' পরিবারকে অব্যাহতভাবে সাহায্য করতেন। এমনকি তিনি নিজের শত্রুদেরও প্রয়োজনের মহূর্তে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করতেন না; শত্রুদের সদুপদেশ দানে কখনো বিরত হতেন না। তাঁর শাহাদাতের পর মানুষ বুঝতে পারে যে, তিনিই প্রতি রাতে অসহায় মানুষদের ঘরে সাহায্য পৌঁছে দিতেন।

ক্ষমাশীলতা : একবার ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সাথে এক জায়গায় বসেছিলেন। এক লোক তাঁর উদ্দেশে কিছু অশ্লীল কথা বলে চলে গেল। ইমাম সেই ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঐ লোককে খবর দিলে সে মনে করল যে, ইমাম হয়তো তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এসেছেন। কিন্তু সেই লোক সামনে আসার পর ইমাম বললেন : '...তুমি যা বলেছ যদি আমার ভিতর তা থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন... আর ঐগুলো যদি আমার ভিতরে না থেকে থাকে তাহলে তাঁর কাছে চাইব যেন তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেন।' এত সেই লোক লজ্জিত হলো এবং ইমামের কাছে ক্ষমা চাইল।

আস-সহীফা আস-সাজ্জাদিয়া

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর ওপর অধিক কঠোরতা আরোপ করা হলে তিনি আন্দোলনের বিকল্প পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। আর সেটা হলো আল্লাহর কাছে নিবেদন পেশ করার জন্য মোনাজাত করা। 'আস-সাহীফা আল-কামিলাহ' বা 'আস-সাহীফা আস-সাজ্জাদীয়া' বলে খ্যাত তাঁর মোনাজাতের এসব মূল্যবান সংগ্রহ 'আলে মুহাম্মাদের যাবুর' বলেও পরিচিত। 'আস-সহীফা আস-সাজ্জাদীয়া' গ্রন্থে ৫৭টি দোয়া রয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রশংসা, মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর দরুদ, ফেরেশতাদের প্রতি দরুদ, নবিগণের অনুসারীদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ চাওয়া, আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, শত্রুদের শত্রুতাকে প্রতিহত করার দোয়া ইত্যাদি। এসব মোনাজাতের মাধ্যমে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) মুসলমান ও বিশ্ববাসীর জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

'রিসালাতুল হুকুক' (অধিকার পত্র)

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হলো 'রিসালাতুল হুকুক' (অধিকার পত্র)। এটি অধিকার সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মহান আল্লাহর

অধিকার, নিজের প্রতি অধিকার, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশীর প্রতি অধিকার এভাবে ৫০টি অধিকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেন : 'তোমার কাঁধে এই পঞ্চাশটি অধিকার রয়েছে যা থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না এবং সেগুলো মেনে চলা ও পালন করার চেষ্টা করা আর এ কাজে মহামহিম আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া তোমার ওপর আবশ্যক।'

এসব অধিকারের মধ্য থেকে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো[১০] :

মহান আল্লাহর অধিকার : আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অধিকার হলো তাঁকে ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুকেই তাঁর অংশীদার বলে মানবে না। যদি নিষ্ঠার সাথে একাজ কর তাহলে আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে তুলে নিয়েছেন যে, তোমার দুনিয়া ও পরকালের কাজের জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। আর তুমি তাঁর নিকট থেকে যা চাইবে সেটা তোমার জন্য সংরক্ষিত রাখবেন।

মানুষের নিজের প্রতি অধিকার : আর তোমার ওপর তোমার নিজের অধিকার হলো তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে লিপ্ত করবে এবং তোমার জিহ্বা দ্বারা তার অধিকার পালন করবে এবং তোমার কর্ণ দ্বারা তার অধিকার পালন করবে এবং তোমার চক্ষু দ্বারা তার অধিকার পালন করবে এবং তোমার হস্ত দ্বারা তার অধিকার পালন করবে এবং তোমার পা দ্বারা তার অধিকার পালন করবে। আর তোমার পেটের অধিকার পালন করবে এবং তোমার লজ্জাস্থানের অধিকার পালন করবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একাজে সাহায্য কামনা করবে।

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকার : তোমার জিহ্বার অধিকার হলো তাকে মন্দকথা থেকে অধিক সম্মানীয় মনে করবে এবং ভাল কথায় তাকে অভ্যস্ত করবে এবং তাকে শিষ্টাচারে অনুগত রাখবে।... তোমার কানের অধিকার হলো তাকে পবিত্র রাখা যাতে তোমার অন্তরের (উৎকর্ষের) পথ হয়, (আর তাকে উন্মুক্ত কর না) কেবল সেই ভালো সংবাদের জন্য ছাড়া যা তোমার অন্তরে শুভ বিষয়ের সঞ্চার করে কিংবা সম্মানীয় কোনো নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করে। কারণ, কান হলো অন্তরের প্রবেশদ্বার।... আর তোমার চোখের অধিকার হলো যা কিছু তোমার জন্য সঙ্গত নয় তা থেকে অবনমিত রাখা এবং এর অশ্লীলতা পরিহার করা, (একে ব্যববহার কর না) কেবল শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্র ছাড়া যা দ্বারা তুমি দৃষ্টিবান হতে পার কিংবা কোনো জ্ঞান অর্জন কর। কারণ, চোখ হলো শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ। আর তোমার দুই পায়ের অধিকার হলো তাদের

দ্বারা যে জায়গায় যাওয়া বৈধ নয় সেখানে যাবে না এবং যে পথে গেলে পথিকের মূল্যহানি ঘটে সেখানে চলবে না। কারণ, তারা তোমাকে বহন করে এবং তোমাকে দীনের পথে নিয়ে যায় এবং (এ ক্ষেত্রে) তোমাকে অগ্রগামী করে।... আর তোমার হাতের অধিকার হলো তোমার জন্য অসঙ্গত কর্মের দিকে তা প্রসারিত করবে না।... আর তোমার পেটের অধিকার হলো তাকে–কম হোক বা বেশি–হারামের পাত্রে পরিণত করবে না। আর হালালের থেকেও পরিমাণ মতো দিবে।... আর তোমার লজ্জাস্থানের অধিকার হলো যা তোমার জন্য বৈধ নয় তা থেকে রক্ষা করা।...

ইবাদতের অধিকার : তোমার নামাযের অধিকার হলো তুমি জানবে যে, নামায আল্লাহ্‌র দরবারে প্রবেশদ্বার।... আর রোযার অধিকার হলো এটা জানবে যে, রোযা হলো একটি পর্দা যা আল্লাহ্ তোমার জিহ্বা, কান, চোখ, লজ্জাস্থান এবং পেটের ওপর ঢেকে দিয়েছেন যাতে তোমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে।... আর সাদাকার অধিকার হলো এটা জানবে যে, সাদাকাহ হলো আল্লাহ্‌র নিকটে তোমার সঞ্চয় এবং এমন আমানত যার কোনো সাক্ষী প্রয়োজন নেই। আর যখন এ বিষয়ে বিশ্বাসী হবে তখন প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনে সোপর্দ করতে বেশি আস্থাশীল হবে।... কোরবানির অধিকার হলো তা নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তে তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হবে এবং কেবল তাঁরই রহমত ও কবুলের জন্য হবে– মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নয়।...

মাতার অধিকার : আর তোমার মায়ের অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে তোমাকে এমন স্থানে বহন করেছে, যেখানে কেউ কাউকে বহন করে না। আর তার হৃদয়ের ফল থেকে তোমার খাবার যুগিয়েছেন যা কেউ কাউকে খাওয়ায় না। সে তোমাকে তার কান দ্বারা, চোখ দ্বারা, হাত, পা ও চুল দ্বারা এবং তার আপাদমস্তক ও সমুদয় অঙ্গ দ্বারা রক্ষা করেছে। আর এসব আত্মত্যাগের দ্বারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত থেকেছে। আর যে কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্টকে বরণ করে নিয়েছে ও তোমার থেকে সেগুলোকে প্রতিহত করেছে। এরপর তোমাকে পৃথিবীতে এনেছে এবং তোমাকে পরিতৃপ্ত করে সে ক্ষুধার্ত থেকেছে, তোমাকে কাপড়ে আবৃত করে বিবস্ত্র থেকেছে, তোমার পিপাসা মিটিয়ে সে তৃষ্ণার্ত থেকেছে, তোমাকে ছায়ায় রেখে সে সূর্যের নিচে থেকেছে, নিজে কষ্ট স্বীকার করে তোমাকে নেয়ামতের মধ্যে রেখেছে, নিজে অনিদ্রায় থেকে তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছে; তবুও সে আনন্দিত থেকেছে। তার পেট ছিল

তোমাকে ধারণ করার পাত্র, আর তার আঁচল হলো তোমার নিরাপদ বিশ্রামাগার, তার স্তন ছিলো তোমার পানির মশক, আর তার জীবন ছিলো তোমার জন্য উৎসর্গিত। তোমার কারণেই এবং তোমার জন্যই সে প্রকৃতির শীত ও গরমকে সয়েছে। তাই তাকে এই পরিমাণে মর্যাদা দিবে। আর তা পারবে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফিক ছাড়া।

পিতার অধিকার : আর তোমার পিতার অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে হলো বৃক্ষকাণ্ড আর তুমি তার শাখাস্বরূপ। আর জেনে রাখবে, সে যদি না থাকত তাহলে তুমি থাকতে না। কাজেই যখনই নিজের মধ্যে এমন কিছু পাবে যা দেখে তোমার ভালো লাগে, জানবে যে, সেটা তোমার পিতার থেকে। আর আল্লাহ্‌কে তত পরিমাণ কৃতজ্ঞতা জানাবে।...

সন্তানের অধিকার : আর তোমার সন্তানের অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে তোমার থেকেই এবং এই দুনিয়ায় তোমার সাথেই সম্পর্কযুক্ত, ভালো হোক আর মন্দ হোক। তোমার ওপরই তার পৃষ্ঠপোষকতার ভার অর্পিত হয়েছে। তাকে ভালোভাবে প্রতিপালন এবং তার মহাপ্রতিপালকের প্রতি নির্দেশনা দানের মাধ্যমে এবং তাকে তোমার ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করার মাধ্যমে তুমি সওয়াব লাভ করবে। আর অবহেলা করলে শাস্তি পাবে। কাজেই তার জন্য এমন কোনো কাজ কর যাতে অস্থায়ী এ দুনিয়ায় তার সুফল পায়, আর তোমার ও তার মধ্যে সম্পর্ককে শোভামণ্ডিত কর, যাতে প্রতিপালকের কাছে তাকে উত্তমরূপে পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার থেকে যে খোদায়ী ফল লাভ করেছ তার কারণে ক্ষমার পাত্র হতে পার।...

ভাইয়ের অধিকার : আর তোমার ভাইয়ের অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে হলো তোমার হাত যা দ্বারা তুমি কাজ কর, আর তোমার পিঠ যেখানে তুমি আশ্রয় গ্রহণ কর, আর তোমার সম্মান যার প্রতি তুমি আসক্ত, আর তোমার শক্তি যা দ্বারা তুমি অভিযান চালাও।...

উপকারীর অধিকার : আর যে তোমার উপকার করেছে তার অধিকার হলো এটা যে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার উপকারকে স্মরণ করবে আর তার সম্পর্কে ভালো কথা প্রচার করবে।...

মুয়াজ্জিনের অধিকার : আর তোমাকে নামাজের দিকে আহ্বানকারীর (মুআজ্জিন) অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে তোমাকে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিয়ে

দেয় এবং তোমাকে তোমার ভালোর দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ্ তোমার ওপর যা কিছু ফরয করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে সে তোমার সর্বোত্তম সাহায্যকারী। তার এই সাহায্য বাবদ তোমার উপকারকারীর মতোই তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।...

প্রতিবেশীর অধিকার : আর প্রতিবেশীর অধিকার হলো যখন বাড়ি থাকে না তখন তাকে (তার অধিকার, সম্পদ ও সম্ভ্রম) রক্ষা করা। আর তার উপস্থিতিতে তাকে সম্মান করা এবং সর্বাবস্থায় তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা। তার ছিদ্রান্বেষণ কর না। আর জানার উদ্দেশ্যে তার দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না।...

বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকার: আর বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকার হলো তার বয়সকে সম্মান করবে এবং যদি ইসলামে সে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে ইসলামের ক্ষেত্রে তার অগ্রগণ্যতাকে বিবেচনা করে তাকে মর্যাদা দিবে।...

বয়োকনিষ্ঠের অধিকার : আর বয়োকনিষ্ঠের অধিকার হলো তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং তাকে আদর-স্নেহে লালনপালন করা এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং তার দোষ না ধরা ও তার সাথে নমনীয়তা প্রদর্শন করা। আর তার শিশুসুলভ ভুলত্রুটিকে মার্জনা করা।...

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর উপদেশমূলক বাণীসমূহ থেকে[১১]

১. ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর এক পুত্রকে বলেন : প্রিয় পুত্র আমার ! পাঁচ ব্যক্তি থেকে বিরত থাকবে, তাদের সাথে ওঠা বসা করবে না, তাদেরকে আলাপের সাথি ও পথের সাথি করবে না। সে বলল : হে পিতা! তারা কারা? ইমাম বললেন : কখনই মিথ্যাবাদীর সাথে ওঠাবসা করবে না। কারণ, সে হলো মরীচিকাসদৃশ, দূরকে নিকট এবং নিকটকে তোমার কাছে দূর করে দিবে। কখনই ফাসেক ও খারাপ ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করবে না। কেননা, সে তোমাকে এক লোকমা কিংবা তার চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করে দিবে। কৃপণ লোকের সহচর হবে না। কেননা, তার প্রতি তোমার চরম প্রয়োজনের দিনে সে তোমাকে ত্যাগ করবে। কোনো বোকার বন্ধু হয়ো না। সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে বসবে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথেও বন্ধুত্ব কর না। কারণ, আমি তাকে কোরআনে অভিশপ্ত পেয়েছি।

২. ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) পরকালের প্রতি মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন : নিশ্চয় দুনিয়া প্রস্থান করেছে এবং পশ্চাৎ প্রদর্শন করেছে আর পরকাল

রওয়ানা হয়েছে এবং এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকেরই সন্তানাদি রয়েছে। তোমরা পরকালের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। দুনিয়া থেকে আত্মসংযমী হবে এবং পরকাল অভিমুখী হবে। কারণ, পরহেযগাররা আল্লাহ্‌র পৃথিবীকে জীবনের ময়দান আর মাটিকে বিছানা বানায়। আর মাটির ঢিলাকে মাথার বালিশ এবং পানিকে সুগন্ধী হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর পৃথিবীতে নির্বিঘ্ন জীবন কাটানোর চিন্তা ত্যাগ করেছে। জেনে রাখ, যে বেহেশতের প্রতি আসক্ত থাকে সে ভালো কাজে ধাবিত হয় এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হয়। যে ব্যক্তি দোযখের ভয় করে সে তার গোনাহ থেকে তওবা করার জন্য আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় এবং হারামসমূহ থেকে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরহেযগার হয় তার জন্য সব বিপদই সহজ এবং তাকে অকল্যাণকর ভাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য এমন সব বান্দা রয়েছে যাদের অন্তর পরকালের প্রতি আসক্ত এবং তার সওয়াবের প্রতি ঝুঁকে থাকে। আর তারা তাদের মতো যারা বেহেশতবাসীদের বেহেশতে চিরস্থায়ী অবস্থায় দেখছে আর তাদের মতো যারা দোযখবাসীদের দোযখে চিরস্থায়ী আযাবের অবস্থায় দেখছে। তারা হলো এমন যারা জনগণের অনিষ্ট ও অবাঞ্ছিত বিষয়াদি থেকে বিমুক্ত। কারণ, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্‌র ভয়ে জনগণের দিকে মনোযোগী নয়। তারা নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দৃষ্টিসমূহকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং জনগণের প্রতি মুখাপেক্ষিতা সামান্যই রাখে। আল্লাহ্‌র থেকে অল্প জীবিকাকেই গ্রহণ করে নিয়েছে। ঐটাই তাদের রুজি। তারা কিয়ামত দিনের দীর্ঘ আফসোস থেকে পরিত্রাণ পেতে সীমিত কিছু দিন ধৈর্যধারণ করেছে।

সকল সহচর ও অনুসারীর প্রতি ইমামের উপদেশ : ...ধিক্ তোমার ওপর হে আদম সন্তান! যে উদাসীন, কিন্তু তার থেকে উদাস থাকা হয়নি। তোমার মৃত্যু সবকিছুর চেয়ে তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এগিয়ে আসছে, দ্রুতবেগে তোমার অভিমুখী হয়েছে। সে তোমাকেই চায় এবং তোমার টুটি চেপে ধরার কাছাকাছি এসে গেছে। ফলে তোমার আয়ু ঘনিয়ে আসছে এবং মৃত্যুদূত তোমার প্রাণ কেড়ে নিবে। আর তুমি একাকী কবরবাসী হবে। তখন তোমার জীবন তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে আর মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয় বিনা অনুমতিতে তোমার কাছে উপস্থিত হবে যাতে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তোমার কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করে। জেনে রাখ! তোমার কাছে তাদের প্রথম প্রশ্নটি হবে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যাকে তুমি উপাসনা কর এবং তোমার নবী সম্পর্কে যিনি তোমার প্রতি প্রেরিত হয়েছেন এবং তোমার দীন সম্পর্কে যা তুমি অনুসরণ করেছ এবং সেই কিতাব সম্পর্কে যা তুমি পাঠ

করতে এবং সেই ইমাম সম্পর্কে যাকে তুমি অনুসরণ করে চলতে এবং তোমার আয়ু সম্পর্কে যে কোন্ কাজে ব্যয় করেছ এবং তোমার ধন-সম্পদ সম্পর্কে যে কোথা থেকে অর্জন করেছ এবং কীভাবে খরচ করেছ। কাজেই নিজের ব্যাপারে সাবধান হও এবং নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং পরীক্ষার আগেই উত্তর তৈরি করে রাখ। যদি তুমি মুমিন হও এবং দীনের হক চিনে থাক এবং সত্যবাদী ইমামগণের অনুসারী হও এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুদের বন্ধু হও তাহলে আল্লাহ্ স্বীয় দলিল-প্রমাণকে তোমার সামনে উপস্থাপন (হৃদয়ে প্রক্ষেপ) করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে বাকসচল করে দিবেন আর তুমি উত্তমভাবে উত্তর দিতে পারবে এবং বেহেশতের ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভ করবে।...

তথ্যসূত্র

১. তাফসীরে কাশ্‌শাফ, রুহুল বায়ান, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে দুররে মানসূর প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের ভালবাসার ওপর মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে, সে পূর্ণ ঈমানসহ মারা যায়, তাকে মালাকুল মাওত ও মুনকির-নাকির বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন, তাকে বেহেশতে সেভাবে প্রেরণ করা হবে যেমন নববধূ স্বামীগৃহে যায়, আর যারা তাদের প্রতি শত্রুতায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামতে তাদের ললাটে লেখা থাকবে, 'এরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত'। স্মরণ রেখ, তারা কাফির, তারা বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না।' তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'তারা কারা, যাদের ভালবাসা আল্লাহ ফরয করেছেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন।' তিনি আরও বলেন, 'যারা এদের ওপর জুলুম করবে এবং এদের ব্যাপারে যারা আমাকে কষ্ট দেবে তাদের জন্য বেহেশত হারাম হবে।'
২. সূরা শুরা : ২৩
৩. সূরা ইসরা : ১৬
৪. সূরা আনফাল : ৪১
৫. সূরা আহযাব : ৩৩
৬. ইহতিজাজে তাবারসী, পৃ. ১৬৭
৭. ওয়াইজম্যান পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত, শেইখ আব্বাস কুম্মি প্রণীত 'শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস', ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩
৮. 'তারীখে দামেশ্‌ক', ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) জীবনী অধ্যায়, পৃ. ৫৬
৯. হুসাইন বাকের প্রণীত 'আল-সাজ্জাদ', পৃ. ৫০
১০. মানব উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'তুহাফুল উকুল আন আলের রাসূল (সা.)' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
১১. প্রাগুক্ত

বিশেষ নিবন্ধ

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ*

ইসলাম কি জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে?

জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝায়?

ইসলাম কি এ রাজনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের সমর্থক?

জবাব

ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ সর্বশেষ শতাব্দী সমূহের ফল যার বীজ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপে রোপিত এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তা বিকশিত হয়েছিল। আর অষ্টাদশ শতকে তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন হতে বিশেষ করে ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে এর ভীত দূর্বল হয়ে পড়ে এবং এর অনাকাঙ্খিত ধ্বংসাত্মক প্রভাব, পরিণতি ও ফলাফলের কারণে এর তীব্রতা ও শক্তিও হ্রাস পায়।

যদিও জাতীয়তাবাদ ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে পতনমুখ অবস্থার মধ্যে রয়েছে তবুও এশিয়ায় বিশেষ করে ইসলামী দেশ সমূহে এখনও জাতীয়তাবাদের জোয়ার প্রবল (রয়েছে)।

তবে অবশ্য বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যুগের প্রয়োনীয়তার কারণে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাটা পড়েছে এবং জাতিসংঘ ও এর অধীনস্থ শাখা-প্রশাখা, ল্যাটিন আমেরিকার জাতি সমূহের আঞ্চলিক জোট, উত্তর আট্‌লান্টিক জোট (ন্যাটো) ইত্যাদির মত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট সংগঠ সমূহের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার ফলে জাতিসমূহের সহযোগিতায় বৃহত্তর জোট ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধারণারও উদ্ভব

---

*আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী প্রনীত প্রশ্নোত্তরসমূহ (پرسشها و پاسخ ها) থেকে অনুদিত

হয়েছে। আর এটা হচ্ছে শ্বয়ং বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের ধারণার ক্রমাবনতি ও পতনের নমুনা ও নিদর্শন স্বরূপ। যাহোক আমরা এখন জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism)- এ দুই মতবাদের সংজ্ঞা এ দুভয়ের শক্তিশালী ও দূর্বল দিকগুলো সমেত বর্ণানা করব এবং সেই সাথে এতদ সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি ও অভিমতও তুলে ধরব।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) হচ্ছে অন্য সকল জাতির চেয়ে নির্দিষ্ট কোন জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা এবং সেই সাথে উক্ত জাতির আকিদা বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ সমূহকেও অন্য সকল জাতির আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা এবং মূল্যবোধ সমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রাধান্য প্রাপ্ত বলে মনে করা।

আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism) হচ্ছে এ ধরণের বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করা যে, বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে যদি পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা বিরাজ করে তাহলে তা মানব জাতির কল্যাণ ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং তা বিশ্ব শান্তিরও কারণ হবে। এ মতাদর্শের সমর্থকগণ বিশ্বব্যাপী এমন এক বৃহৎ সরকার ও রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয় যা পৃথিবীর সকল জাতি বা সম্প্রদায়কে পরিচালনা করবে অথচ এর ফলে কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের জাতি সত্ত্বা, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ব শাসন ও সার্বভৌমত্বের বিন্দু মাত্র ক্ষতি সাধন হবে না।

রাজনৈতিক মতাদর্শ সর্মহ বিষয়ক লেখক ও রচয়িতাগণ বিশ্বাস করেন যে, এতদর্থে জাতীয়তাবাদ আধুনিক অর্থাৎ সর্বশেষ শতাব্দী সমূহের ফল এ বিগত শতাব্দীসমূহে এ আধুনিক অর্থে জাতিয়তাবাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

এটা নিশ্চিত যে, মানব প্রেমিক ব্যক্তি যে মানবীয় আশা-আকাঙ্খার অধিকারী তার দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের এক বিশেষ ধরণের প্রকাশমানতা রয়েছে যদিও খোদয়ী (ঐশ্বরিক) মতাদর্শের উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে একটি একক বিশ্ব হুকুমৎ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয় এবং বস্তুবাদী মানুষেরাও কখনো উন্নত ও অনুন্নত দেশ ও রাষ্ট্র সমূহের মধ্যকার ঐক্যকে দৃঢ় ও মজবূত করতেও সক্ষম হবে না। আর পরিণতিতে, দূর্বল জাতি সমূহের স্বৈরাচারী শাসকদের শাসনও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থেকে যাবে। এ ব্যাপারে যা কিছু বলা হচ্ছে (হয়ে থাকে) সেগুলো সবই আসলে ঐ সব মানব আবেগ ও অনুভূতির উথ্‌লে ওঠার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ধর্মের সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত যার কার্যকারিতা হবে আসলেই অতি সামান্য ও অকিঞ্চিতৎ। তাই জাতি সমূহের মধ্যকার এ ধরণের ঐক্যের প্রবক্তা ও দাবীদারগণ

যখনই কর্ম তৎপরতা শুরু করতে যাবে ঠিক তখন তার সকল জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে কট্টর জাতীয়তাবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা সবাই জানি যে, নিয়ামিষ ভোগী হিন্দুরা কোন প্রাণীকেই কষ্ট দিতে চাই না। এমন কি তারা এ অজুহাত দেখিয়ে পশু জবাই ও শিকার করা থেকেও বিরত থাকে এবং গোশতের বদলে তারা উদ্ভিদ ও নিরামিষ ভোগী অর্থাৎ শাক শব্জি খেয়ে থাকে। (কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষের স্বাধীনতা ও বিভক্তি কালে) হিন্দু মুসলমান এ দুই জাতির স্বার্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে এই হিন্দু জাতির হাত কুনুই পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তে নিমজ্জিত (রঞ্জিত) হয়ে যায় এবং কাশ্মীর সমস্যা ক্ষতের নীচে অস্থির রূপ পরিগ্রহ করে যা সর্বদা পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমান ও হিন্দু জাতির মধ্যে স্থায়ী অশান্তির ইন্ধন যোগাচ্ছে। কারণ জাতীয় আশা আকাঙ্খা কে মানবীয় আশা আকাঙ্খার উর্ধ্বে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ কারণে অবশ্যই বলা উচিৎ জাতীয়তা সমূহকে উপেক্ষা করে মানব জাতির আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন এবং মানব সমাজের সেবা (খেদমৎ), ঐশ্বরিক মতাদর্শ যা মানুষের অন্তরাত্মাকে খাঁটি মানব প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলে সেই মতাদর্শের উপর নির্ভর কর ব্যতীত কখনোই সম্ভব নয়। এই ঐশ্বরিক খোদায়ী মতাদর্শের বাণী সমূহ থেকে: (الناس امامَ الحقِّ سواءٌ) সকল মানুষ আইন ও হকের (অধিকার) দৃষ্টিতে এক সমান (ও অভিন্ন) (النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ)

সমগ্র মানব জাতি চিরুনীর দাঁত সমূহের মত পরস্পর সমান।

এ ধরনের মতাদর্শে অনুসারীরাই কেবল সকল জাতীয়তা এবং জাতি সমূহের ব্যক্তিত্ব ও (জাতি) সত্ত্বা সংরক্ষণ করে সবাইকে এক বিশেষ হুকুমৎ ও সরকারের শাসনাধীনে আনতে এবং বিশেষ কোন জাতির সৌভাগ্যের পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে সকল মানব জাতির সৌভাগ্যের পুনরুজ্জীন ঘটাতে সক্ষম।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার (হক ও বাতিল) সংমিশ্রণ। তাই এর শক্তিশালী দিকগুলোর পাশা পাশি এর দূর্বল দিক গুলোও বিদ্যমান রয়েছে। পরিণতিতে এ মতবাদ যেমন সৃজনশীল ঠিক তেমনি তা ধ্বংসাত্মকও বটে। তবে মুসলিম দেশ ও রাষ্ট্র সমূহে এর ধ্বংসাত্মক দিক, এর সৃজনশীল ও ইতিবাচক দিকের চেয়ে ঢের বেশী। যেহেতু ইসলামী (মুসলিম) জাতি সমূহের মাঝে পাশ্চাত্যই জাতীয়তাবাদের লালন ও বিকাশের চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেহেতু পাশ্চাত্য' জাতীয়তাবাদের ধ্বংসাত্মক দিকের জন্য চাচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য বিনষ্ট (করতে), মুসলমানদের মাঝে

অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি (করতে) এবং ভ্রাতৃ প্রতিম মুসলিম জাতিসমূহকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতায় লিপ্ত করতে যাতে করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও দ্বীনী ঐক্যের বদলে তারা (মুসলিম জাতিসমূহ) বিভিন্ন জাতীয়তা ও জাতি সত্বায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখন কিছু বিষয় উল্লেখ করব :

রাজনৈতিক মতবাদসমূহের লেখকগণ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করে থাকেন তাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি পরিদৃষ্ট হয় :

১. যে ভূখণ্ডে মানুষ লালিত পালিত ও বড় হয়েছে সেই ভূখন্ডের প্রতি তার টান
২. যে জাতির মাঝে সে বড় হয়েছে সেই জাতির প্রতি তাঁর টান
৩. নিজ জাতির অর্জিত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কীর্তি এবং ঐতিহ্য সমূহ।
৪. স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রতি ঝোক ও প্রবণতা

এ ধরনের ধারণা (Concepts) সমূহকে জাতীয়তাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য করা যায় না। কারণ মানূষের সাথে এই ধরনের টান, আকর্ষণ, ঝোক ও প্রবণতা সমূহ ফিৎরী অর্থাৎ তারসহজাত প্রকৃতি প্রসূত। যখন কোন মানুষ কোন ভূখন্ড বা জনপদের মধ্যে বড় হয়েছে তখন তাদের প্রতি তার টান ও ভালবাসা অথবা তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির প্রতি তার টান ও আগ্রহ আসলে নিতান্ত স্বাভাবিক বিষয়ই হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সাথে এ বিষয়টা অনুভব ও উপলব্ধি করে থাকে। আবার একই ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গাও স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাতিও হচ্ছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সব বিষয়কে জাতীয়তাবাদের খাতায় হিসেব করা অনুচিত। এ মতাদর্শ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত করেও এ সব অর্জন করা সম্ভব।

মহনবী (সা.) মক্কা নগরী থেকে মদীনায় হিযরত করার সময় পথিমধ্যে জন্মভূমি মক্কার কথা স্বরণ করলেন এবং মাঝে সেখানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করার আগ্রহ অনুভব করলেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী অবতীর্ণ এবং তাঁকে (সা.) ওয়াদা দেয়া হল: যে আল্লাহ আপনার উপর পবিত্র কোরআনের প্রচার ওয়াজিব করেছেন তিনি আপনাকে আপনার জন্ম ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।[১] আর মহান আল্লাহর এ ওয়াদা ৭ম হিজরীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১. সূরা-ই কাসাস: ৮৫

মক্কা বিজয়ের সময় -৮ম হিজরীতে- মহানবী (সা.) যখন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর ব্যাপারে স্বীয় টান ও ভালবাসা ব্যক্ত করে বলেছিলেন: হে মক্কা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদেরকে যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা না হত তাহলে আমি তোমাকে কখনো ত্যাগ করতাম না।[১] এমন কোন জাতি, গোত্র ও পূর্ব পুরুষগণ যারা মানুষের উৎস্যমূল বলে গণ্য (হয়) তাদের সাথে রক্ত ও বংশগত সম্পর্ক আছে বলে ব্যক্ত করাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের এক অন্যতম নিদর্শণ (স্বরূপ)। যেমন: এ কথা বলা যে "আমি অমুক গোত্র বা জাতির অন্তর্ভক্ত অথবা নিজেকে কোন বিশেষ জাতির সাথে সম্পর্কিত বলে গণ্য করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত আছে। আর তা হল: এ ধরনের সম্পর্ক যেন গর্বের কারণ না হয়। বরং তা যেন মানুষের পরিচিতি ও শনাক্ত উপায় ও পন্থা হয়। পবিত্র কোরআন এ বাস্তবতাটা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছেন: (وَ جَعَلْنا كُمْشُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا) এবং আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও কাবীলায় (গোত্র) বিভিক্ত করেছি যাতে তোমরা নিজেদেরকে চিনতেও শনাক্ত করতে পার।[২] অর্থাৎ কোন কাবীলর (গোত্র) সাথে সম্পর্কিত হওয়া অবশ্যই এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির শনাক্ত ও পৃথক করার উপায় বা ওয়াসীলা হতে হবে না তা হবে বংশীয় গৌরব ও অহংকারের কারণ। যে সব অস্থি ও হাড্ডি পচে গলে গেছে সেগুলোর সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করার মাধ্যে কোন গর্ব ও গৌরব নেই। বরং মানুষের গৌরব হচ্ছে তার তাকওয়া পরহেযগারী যা তাকে অর্জন করতে হয়।

জাতীয়তাবাদের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিক সমূহ হচ্ছে ঐ সব দিক যা আমরা বর্ণনা করলাম। তবে অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে, ইসলামী দেশ সমূহ অথবা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ সমূহে এই রাজনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ উত্থাপন করার লক্ষ্যই হচ্ছে এর ধ্বংসাত্মক দিক সমূহ যেগুলো আমরা এখন নীচে উল্লেখ করব:

১.ইসলামী ঐক্য ধ্বংস ও নষ্ট করা: ইসলামী দৃষ্টিতে ভাষা, বর্ণ (face), রক্ত সম্পর্ক (blood) ভূখণ্ড ইত্যাদির মত যে সব উপাদান ও মৌল একটি জাতি সত্ত্বার গাঠনিক

১. সীয়া-ই হালাবী, খণ্ড ২, পৃ: ৯৮
২. সূরা-ই হুজুরাত: ১৩

উপাদান বলে বিবেচিত সেগুলোর মধ্যে কেবল "ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস এবং চিন্তাগত ঐক্য"ই আসলে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি বিনির্মাণ করতে সক্ষম যা জাতীয় লাভ লোকসানের ক্ষেত্রে জাতির সকল সদস্যকে যেমন পরস্পর শরীক (অংশীদার) করে ঠিক তেমনি তা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে ঐক্য বদ্ধ এক অভিন্ন উম্মতেও পরিনত করে যদিও ভাষা, রক্ত -বর্ণ, ভূখন্ড ও আবাস স্থলের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) নিঃসন্দেহে (নিশ্চয়) এটাই হচ্ছে তোমাদের জাতি যা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ এক উম্মৎ, আর আমি হচ্ছি তোমাদের প্রভূ। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত কর।[১] (وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون) নিঃসন্দেহে (নিশ্চয়) এটি হচ্ছে তোমাদের জাতি যা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ এক উম্মৎ। আর আমি হচ্ছি তোমাদের প্রভূ। অতএব, তোমরা সবাই আমাকে ভয় কর।[২] অথবা পবিত্র কোরআন সবাইকে পরস্পর ভাই এবং মহান আল্লাহর কাছে সবাই যে সমান তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছে: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই।[৩]

একদিন সালমান ফারসী মহানবী (সা.)এর মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে মহানবী (সা.) এর কতিপয় সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। বংশ ও রক্ত সম্পর্ক সম্পর্কে কথা উত্থাপিত হলে প্রত্যেকেই নিজের বংশ ও খান্দান সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলছিল। সালমানের পালা আসলে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে বললেন "সালমান, আপনিও আপনার বংশ ও খান্দান সম্পর্কে কিছু বলেন :

আমি সালমান ইবনে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর দাসের সন্তান সালমান) আমি গোমরাহ ছিলাম। অতঃপর, অতঃপর আল্লাহ পাক আমাকে হযরত মুহাম্মাদের মাধ্যমে হিদায়েত করেছেন এবং আম রিক্ত হস্ত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে আমাকে ধনী ও স্বচ্ছল করেছেন (এবং তিনি আমার সকল অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন)। আমি ক্রীতদাস ছিলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ পাক আমাকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে আজাদ (মুক্ত) করেছেন। এই হচ্ছে আমার বংশ ও খান্দানের পরিচয়।

ইত্যবসরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং সালমানও পুরো ঘটনাটা তাঁর (সা.) কাছে বললেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপস্থিত

১. সূরা আম্বিয়া : ৯২
২. সূরা মু'মিনুন : ৫২
৩. সূরা হুজুরাত : ১০

ব্যক্তিবর্গ যারা ছিল কুরাইশ বংশীয় তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হে কুরাইশ বংশীয়গণ, মানুষের দ্বীনই হচ্ছে তার বংশ পরিচিত (حَسَب)। তার বন্ধু ও সাথী হচ্ছে তার স্বভাব চরিত্র (আখলাক) এবং তার উৎসমূল (اصل) হচ্ছে তার আকল (বিবেক-বুদ্ধি)।[১]

ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে: উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে একজন ইরানী দাসও ছিল। সে এক শত্রু সৈন্যের উপর এক আঘাত হেনে গর্ব ভরে বলেছিল : আমার থেকে এ আঘাতটা গ্রহণ কর। আমি একজর ইরানী জওয়ান (যুবক)। ঐ ইরানী যুবকের কথা যা অন্যদের জাতি ও বর্ণগত গোঁড়ামীর উদ্রেক করতে পারত তা মহানবী (সা.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি যুবকটিকে বললেন, 'তুমি কেন বললে না : আমি একজন আনসারী জওয়ান (যুবক)।'[২] এটাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসৃত রীতি নীতি। অথচ জাতীয়তাবাদ চায় বিশ্বাস ও আকীদাগত ঐক্যের পরিবর্তে অন্যান্য মৌল ও নিয়ামক (factors) ব্যবহার করতে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বহুত্বে ও দ্বিধা বিভক্তিতে রুপান্তরিত করতে; আরব, আজম (অনারব) তুর্ক, পারস্য এবং সকল মুসলিম গোত্র, সম্প্রদায় ও কওমের ঐক্য (একত্ব) কে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও ভাষায় বিভক্ত করতে। ফলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাতের মাঝে কপটতা (নিফাক), বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন হবে এবং ইসলামের সুবিশাল শক্তি ও ক্ষমতা নাস্তা নাবুদ হয়ে যাবে। অবশেষে এ সর মুসলিম জাতিসমূহের উপর পরা শক্তি বর্গের আধিপত্য স্থাপনের পথও সহজ ও সুগম হবে।

ইতিহাসে কোন জাতির যদি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অর্জন সমূহ থেকে থাকে তাহলে তা সমালোচনার বিষয় বস্তু হওয়া উচিত নয়। তবে এ প্রসঙ্গটা আমাদের দেশে (ইরান) এবং এতদ সদৃশ্য অন্যান্য দেশে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, অন্যান্য মুসলিম জাতির সাথে আমাদের (ইরানী জাতি) সম্পর্কচ্ছেদ করানই হচ্ছে যেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। কেবল এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না বরং ইসলামের দুশমনেরা চায় আমাদের জাতি (ইরানী জাতি) দীর্ঘ ১৪ শতাব্দী ধরে ইসলামের ইতিহাস থেকে যে সব মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করেছে তা ধ্বংস করে দিতে এবং জাতীয়তাবাদের নামে আমাদের সকল সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক (জ্ঞানগত) বুদ্ধি বৃত্তিক গৌরবের উপর আঘাত হানতে। আর তখন আমরা (ইরানী জাতি) থাকব এবং আমাদের সাথে অবশিষ্ট থাকবে শুধু কূরোশ ও দারায়ুশের যুগের কীর্তি ও

১. রওযাতুল কাফী, পৃ. ১৮১; বিহারুল আন্ওয়ার, খণ্ড ২২, পৃ. ৩৮২
২. সুনান-ই আবু দাউদ, খণ্ড- ২, পৃ. ৬২৫

গৌরব। কিন্তু ১৪ শতাব্দী যাবৎ ইসলামের অর্জিত তাবৎ বৈজ্ঞানিক (জ্ঞানগত), সাংস্কৃকিত ও রাজনৈতিক অবদান কীর্তি ও ঐতিহ্য থেকে ইরান ও ইরানী জাতিকে বিছিন্ন করা হলে তা ইরানী জাতির উভয় কীর্তি ও ঐতিহ্য ধ্বংস ও বিনষ্ট করা ব্যতীত আর কোন সুফল বয়ে আনবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৪ ধারা বিশিষ্ট একটি ইসতেহার (সনদ) প্রকাশ করেন। উক্ত ১৪ ধারার একটি হচ্ছে : জাতীয় স্বাধীনতা। এর পরিণতিতে উসমানী (অটোম্যান) সাম্রাজ্য ও খিলাফৎ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কেবল দূর্ভাগ্য, ব্যর্থতা, পুতুল ও শিখান্ড সরকার সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম বিশ্বে অবৈধ ইস্রাইলের বীজ রোপণ করা ব্যতীত এর আর কোন সুফল প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

২. বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির লালন

জাতীয়তাবাদের মাঝে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ বিকাশ (সাধিত) হয় এবং (সাম্রাজ্যবাদী) শক্তিশালী সরকার ও রাষ্ট্র সমূহ একই ভাষা ভাষী ও বর্ণের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সমূহ যারা দেশের বাইরে (প্রবাসে) জীবন যাপন করছে তাদের ভূখন্ড নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ওদখল করার চেষ্টা করে থাকে। এমনকি ব্যস এতটুকুও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তারা সংখ্যালঘু অধীন জাতিসমূহের অস্তিত্ব মুছে ও বিলীন করে দিতে চায়।

ইউরোপে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, দেশ বিজয় এবং সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও বিহেলিত রাখায় পর্যবসিত হয়েছে। এ জাতীয়তাবাদ সেখানে বর্ণবাদী উপাখ্যান ও প্রথা সমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল এবং ধ্বংস সাধন ব্যতীত তা আর অন্য কোন ফলাফল বয়ে আনে নি। এমনকি তা (ইউরোপের অর্থাৎ জার্মানী ও ইতালিতে) নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট মতবাদী স্বৈরাচারী সরকার সমূহকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে ব্যাপক আগ্রসন ও যুদ্ধের কারণ হয়েছিল।

সংক্ষেপে, জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিভিন্ন দিক রয়েছে। ইতিবাচক ও মানবিক দিক সমূহ গ্রহণ করে এর সকল নেতিবাচক ও অমানবিক দিক সমূহের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। প্রধানত ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করত: জাতীয়তাবাদের আহবান শুরু করা হলেও অবশেষে এর নেতিবাচক ও রুঢ় দিকগুলো বাস্তবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

বিশ্ব পরিস্থিতি

ওয়াহাবিদের মতবাদের স্বরূপ

ওয়াহাবি মতবাদের স্বরূপ

মোহাম্মাদ রেজওয়ান হোসাইন

'ওয়াহাবি' মতবাদও অপরাপর বহু ফেরকার মতো একটি ফেরকা। ওয়াহাবি মতবাদের মূল ভাবনাগুলো গৃহীত হয়েছে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা থেকে। তাই প্রথমেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নেওয়া জরুরি। ৬৬১ হিজরিতে তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম তৎকালীন তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় হাররান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনে তাইমিয়া নামেই বেশি পরিচিত।

দামেস্কে যাবার পর 'দারুল হাদিস'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন ইবনে তাইমিয়ার পিতা। সেখানে ইবনে তাইমিয়া পড়ালেখা করেন। তিনি তাঁর যৌবনকাল কাটান দামেস্কে। তাঁর পিতাসহ হাম্বালি মাযহাবের বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে তিনি ফিকাহ, হাদীস, উসূল, তাফসীর, কালামশাস্ত্র ইত্যাদি শেখেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং কোরআনের তাফসীর পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ইবনে তাইমিয়া অন্যান্য ধর্ম এবং মাযহাব নিয়েও পড়ালেখা করেন এবং এমন কিছু ফতোয়া দিতে থাকেন যেগুলোর সাথে আহলে সুন্নাতের চার মাযহাবেরও কোনো মিল ছিল না।

ইবনে তাইমিয়া নিজেকে 'সালাফি' বলে মনে করতেন। সালাফি শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে মূল নীতির অনুসরণ বা পূর্বপুরুষদের নিঃশর্ত অনুসরণ করা। তবে 'সালাফিয়া' একটি ফেরকার নাম যে ফেরকায় মহানবী (সা.), তাঁর সাহাবীবর্গ এবং তাবেয়ীদের অনুসরণের দাবি করা হয়। (তাবেয়ীন বলতে বোঝায় এমন শ্রেণির লোকজনকে যাঁরা এক বা একাধিক সাহাবীর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন।) সালাফিরা মনে করত ইসলামের সকল আকিদা-বিশ্বাস সাহাবী এবং তাবেয়ীদের আমল অনুযায়ী

বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। আর ইসলামী আকিদা কেবল কোরআন ও সুন্নাত থেকেই গ্রহণ করতে হবে, আলেমদের উচিত হবে না কোরআনের বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোনো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কিছু আমল বা বাস্তবায়ন করা। সালাফিদের চিন্তায় বিবেক-বুদ্ধি বা যুক্তি তথা গবেষণার কোনো স্থান নেই, তাদের কাছে কেবল কোরআন-হাদীসের মূল টেক্সটের বাহ্যিক অর্থই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

ইবনে তাইমিয়া যখন তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাপ্রসূত বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সেসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ্ সশরীরী একটি সত্তা এবং তিনি আকাশসমূহের ঊর্ধ্বে থাকেন। ইবনে তাইমিয়াই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহ্র সশরীরী সত্তার প্রবক্তা এবং এর পক্ষে লেখালেখিও করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর রওজা শরীফ যিয়ারত করা কিংবা তাঁর সম্পর্কে কোনো স্মরণসভা বা কোনো অনুষ্ঠান করাকে হারাম এবং শির্ক বলে মনে করতেন।

ইবনে তাইমিয়া মহানবীসহ সকল ওলি-আউলিয়ার কবর মেরামত করা বা পবিত্র কোনো কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করারও বিরোধী ছিলেন এবং এ ধরনের কাজকে তিনি শির্ক বলে মনে করতেন। তাঁর এসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাযহাবের আলেমগণ তীব্র প্রতিবাদ জানান।

মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য সাংঘর্ষিক হবার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যার পরিণতিতে ৭০৫ হিজরিতে সিরিয়ার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে মিশরে নির্বাসনের রায় দেয়। ৭০৭ হিজরিতে তিনি কারামুক্ত হন এবং কয়েক বছর পর আবার সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে পুনরায় লেখালেখি করতে থাকেন। ৭২১ হিজরিতে আবার তাঁকে আটক করা হয় এবং ৭২৮ হিজরির জিলকদ মাসে দামেস্কের কেল্লা কারাগারে মারা যান।

ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাদর্শনেরও প্রায় মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ শতাব্দী পর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদি নামের এক ব্যক্তি ইবনে তাইমিয়ার আকিদার ভিত্তিতে নতুন করে একটি ফেরকার জন্ম দেন। তাঁর ঐ ফেরকার নাম হচ্ছে 'ওয়াহাবিয়্যাত' বা ওয়াহাবি মতবাদ। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব ১১১৫ হিজরিতে সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেন।

তরুণ বয়সে তিনি ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন এবং পুনরায় সালাফি মতবাদের প্রচার ঘটান।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব মদীনাতেও ইসলামের নবীর শরণাপন্ন হওয়া বা তাঁর রওজা যিয়ারত করতে আসা মানুষের সমালোচনা করতেন। ওয়াহাব ধর্মের সরল সঠিক পথ থেকে এত বেশি বিচ্যুত হন যে, আপামর মুসলমানকে 'কাফের' ও 'মুশরিক' বলে বেড়াতে শুরু করেন, এমনকি মুসলমানদের হত্যা করাকে ওয়াজিব বলেও মন্তব্য করেন। ধর্মীয় পবিত্র স্থাপনাগুলো দখল করা এবং ধ্বংস করাকে তাঁর অনুসারীদের ওপর ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেন। সহিংসতা ছিল আবদুল ওয়াহাব এবং তাঁর অনুসারীদের আচরণগত প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের আকিদার বিষয়টি স্পষ্ট হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে বড় বড় বহু আলেম এগিয়ে আসেন। স্বয়ং তাঁর ভাই শায়খ সোলায়মান, যিনি ছিলেন একজন হাম্বালি আলেম, তিনিও ওয়াহাবের আকিদা প্রত্যাখ্যান করে একটি বই লেখেন। তারপরও আবদুল ওয়াহাব তাঁর জাহেলি বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকেন এবং যে কেউ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করলে তাকে 'কাফের' বলে সাব্যস্ত করেন।

এমনিতেই পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো এ সময় চারদিক থেকে মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। ব্রিটিশরা পূর্বদিক থেকে ভারতের বৃহৎ অংশ দখল করে পারস্য উপসাগর উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা প্রতিটি মুহূর্তে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ফরাসিরা নেপোলিয়নের নেতৃত্বে মিশর, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন দখল করে ভারতের দিকে যাবার চিন্তা করছিল। রুশরাও চেয়েছিল ইরান এবং তুরস্কে বারবার হামলা চালিয়ে তাদের সাম্রাজ্য একদিক থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত অন্যদিকে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে। সে সময়ের আমেরিকাও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। তারা লিবিয়া এবং আলজেরিয়ায় গুলিবর্ষণ করে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। এমন একটি কঠিন পরিস্থিতিতে যখন শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক হৃদ্যতার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সে সময় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে মুসলিম ঐক্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

ওয়াহাবি মতবাদ প্রচারের একেবারে শুরুতেই যে কাজটি করা হয় তা হলো উয়াইনায় অবস্থিত সাহাবীদের এবং অলি-আউলিয়ার মাযারগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব আল্লাহ্‌র অলিদের শরণাপন্ন হওয়াকে শির্‌ক এবং মূর্তিপূজার মতো অপরাধ বলে গণ্য করত এবং যারা একাজ করত তাদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করতেন। তাদেরকে হত্যা করা জায়েয এবং তাদের মালামালকে যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ফতোয়া পেয়ে তাঁর অনুসারীরা হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বিভিন্ন শহরের লোকজনকে তাঁর মতবাদের দিকে আহ্বান জানাত। যারা গ্রহণ করত তারা নিরাপদ ছিল, আর যারা বিরোধিতা করত তাদের জান-মালকে হালাল ঘোষণা করে আক্রমণ চালানো হতো। নাজ্‌দ এবং নাজ্‌দের বাইরে ওয়াহাবিরা এরকম বহু যুদ্ধ করেছে। ইয়েমেন, হেজাজ, সিরিয়ার উপকণ্ঠ ও ইরাকে ওয়াহাবিরা যত যুদ্ধ করেছে সবই তাদের মতবাদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণেই করেছে। ওয়াহাবের দৃষ্টিতে পবিত্র কোনো স্থাপনা, যেমন অলি-আউলিয়া, আহলে বাইতের ইমামদের মাযারের মতো মহান স্থাপনাগুলো যিয়ারত করা শির্‌ক। তাই এসব স্থাপনা যিয়ারতকারীদের জানমাল হরণ করা সওয়াবের কাজ। মক্কা দখল করার পর ওয়াহাবিরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিদর্শনগুলো ধ্বংস করে দেয়। নবীজী (সা.)-এর জন্মস্থানের গম্বুজ, কাবায় হযরত আলী (আ.)-এর জন্মস্থানের গম্বুজ, হযরত খাদিজা (আ.) ও হযরত আবু বকরের স্মৃতিময় নিদর্শনগুলো ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। ওয়াহাবিরা এসব পবিত্র স্থাপনা ধ্বংস করার সময় তবলা বাজিয়ে গান গেয়ে নেচে নেচে উল্লাস করত। মুসলিম বিশ্বে ওয়াহাবিদের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

ওসমানী সাম্রাজ্য সে সময় হেজাজ, ইয়েমেন, মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরাকের মতো মুসলিম ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ওসমানী বাদশাহ মিশরের গভর্নরকে আদেশ দিয়েছিলেন ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ আলি পাশা ওসমানী সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা, মদীনা ও তায়েফকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। এভাবেই ১২১৩ হিজরিতে অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবি মতবাদের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। এরপর অন্তত এক শতাব্দী সময়কাল পর্যন্ত ওয়াহাবি মতবাদের নামটিরও আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিংবা এই ফেরকাটি নিয়ে আর কেউ কখনো কোনোরকম চিন্তাভাবনা করেনি।

আপামর জনগণ ওয়াহাবিপন্থীদের ভয়ে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই ভয় মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে কেটে যায়। কিন্তু ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ইতিহাসের বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আবদুল আযিযের আগমনে সৌদ বংশের শক্তি যেমন ফিরে আসে তেমনি বিচ্যুত ঐ ওয়াহাবি মতবাদের চর্চাও পুনরায় শুরু হয়।

সালাফিয়া আকিদায় বিশ্বাসীদের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো তারা মনে করে কেবলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সশরীরী উপস্থিতির স্থান। নামায পড়ার সময় এভাবেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকল মুসল্লির সামনে উপস্থিত থাকেন বলে তাদের বিশ্বাস। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনে হাজার মাক্কি তাঁর 'আলফাতাভি-আল-হাদীসা' নামক গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন : 'খোদা তাকে অন্ধ, বধির, গোমরাহ, হীন এবং অপদস্থ করে দিয়েছেন। তার সমকালীন আহলে সুন্নাতের ফকিহ ইমামগণ, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী ফকিহগণ তাইমিয়ার চিন্তা-চেতনা এবং কথাবার্তা সম্পর্কে বলেছেন : 'ইবনে তাইমিয়ার কথাবার্তা মূল্যহীন এবং সে বেদআত সৃষ্টিকারী, গোমরাহ ও ভারসাম্যহীন।'

ইবনে তাইমিয়া আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে আমাদের বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব। ওয়াহাবিরা আল্লাহ্‌কে দেখার বিষয়টি নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করেছে, এত বেশি সীমালঙ্ঘন করেছে যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো সচেতন চিন্তার মানুষই তাদের ওই চরমপন্থী কথাবার্তায় বিস্মিত না হয়ে পারেন না। ইবনে তাইমিয়া বিশ্বাস করেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক তাঁর নিজ চেহারায় মানুষের সামনে আসবেন এবং আত্মপরিচয় দিয়ে বলবেন : 'আমি তোমাদের আল্লাহ্।'

ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারার অন্যতম প্রচারক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বলেছিলেন : 'যারা ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং আল্লাহ্‌র অলিদেরকে নিজেদের শাফায়াতকারী হিসেবে চিন্তা করে কিংবা তাঁদের উসিলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশা করে, তাদেরকে হত্যা করা বৈধ এবং তাদের ধনসম্পদ মোবাহ (অর্থাৎ কেড়ে নেয়া যাবে)।' মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব তাঁর এই মনগড়া চিন্তাধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই নিজের বিচ্যুত

চিন্তাধারাকে ইসলামের ধর্মীয় চিন্তা বলে উল্লেখ করেছেন। শিয়াদের ব্যাপারে ওয়াহাবিরা কুফ্‌রির অভিযোগ এনে তাদের হত্যা করাকে হালাল বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবতা হলো এই যে, আল্লাহ্‌র একত্ব, নবী করিম (সা.)-এর রেসালাত, কোরআনের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের সাথে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন।

ইসলামে যিয়ারতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যিয়ারত মুসলমানদের ইবাদতের কর্মসূচিগুলোর একটি। মুসলমানরা শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাস অনুযায়ী তাওয়াসসুল এবং পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তর্কাতীত বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু সালাফিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে তাইমিয়া নবীজী (সা.)-এর কবর যিয়ারত করাকে, এমনকি যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করাকে 'কবর পূজা' বলে অভিহিত করে এটাকে জাহেলিয়াতের যুগের মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতেও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব আলে সৌদের সহযোগিতায় ইবনে তাইমিয়ার আকিদার বিস্তার ঘটান, যিয়ারতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হারাম শরীফের নিকটবর্তী কবরসমূহ ও অন্যান্য পবিত্র স্থাপনা ধ্বংস করে ফেলেন। অথচ যিয়ারত সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম (সা.)এর একটি হাদীস হলো, 'বেশি বেশি কবর যিয়ারত করবে যাতে পরকালীন পৃথিবীর কথা মনে জাগে।' আরেকটি হাদীস এরকম, 'কবর যিয়ারতে যাবে। কেননা, তার মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা।' এই দুটি হাদীস ও এরকম আরো অনেকে হাদীসের আলোকে ইবনে তাইমিয়ার কথাবার্তা কেবল যে ভিত্তিহীন এবং বাতিল তাই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি চরম অবমাননা ও বেয়াদবিপূর্ণও বটে।

মুসলমানরা সবসময়ই দ্বীনের মহান মনীষীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁদেরকে স্মরণ করে এসেছে। এমনকি তাঁদের সমাধিসৌধ নির্মাণ করে মাযারের পাশে মসজিদ তৈরি করে ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে মনীষীদের স্মৃতিকে মনের ভেতরে জাগ্রত রেখে এসেছে। কিন্তু ওয়াহাবিরা আল্লাহ্‌র অলি, সালেহীন, এমনকি নবীদের কবরের ওপরেও মসজিদ কিংবা সমাধিসৌধ নির্মাণ করাকে বেদআত বলে অভিহিত করেছে। ১৯২৬ সালে মদীনায় বাকী কবরস্থানে নবী করিম (সা.)-এর সাহাবীবৃন্দ এবং তাঁর বংশের ব্যক্তিত্বগণের মাযারগুলোকে ধ্বংস করার ঘটনা ওয়াহাবিদের সবচেয়ে

ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ধৃষ্টতামূলক আচরণ হিসেবে পরিগণিত। অথচ আজ পর্যন্তও সালাফি বা ওয়াহাবি আলেমরা তাদের এই অমানবিক, নোংরা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের পক্ষে দ্বীনি প্রমাণ তো দূরের কথা, বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো যুক্তিও দেখাতে পারেনি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিয়া মাযহাবের অনুসারিগণ রাসূলে খোদা (সা.)-এর সন্তান এবং তাঁর বংশধরদের কবরের ওপর স্থাপনা বা সৌধ নির্মাণ করেছেন। সুন্নি মাযহাবের অনুসারীরাও শহীদান এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবরের ওপর গম্বুজ ও স্থাপনা নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের কবর যিয়ারত করেন। সব মুসলমানই নবী-রাসূলসহ আল্লাহ্‌র অলিদের কবর যিয়ারত করাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একটি উপায় বলে মনে করেন। সে লক্ষ্যে এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করাটাও ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের অংশ বলে মনে করেন। কেবল ওয়াহাবি মতবাদের অনুসারীরাই এর বিরুদ্ধে গিয়ে পবিত্র স্থাপনাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলায় বিশ্বাস করে। ওয়াহাবি মতবাদের আবির্ভাবের আগে ইসলামের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন আংটি, জুতা, মেসওয়াক, তলোয়ার, ঢাল, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব কূপ থেকে পানি খেয়েছেন সেই কূপগুলো পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ওয়াহাবিদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে সেগুলোর খুব কমই এখন অবশিষ্ট রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার সমকালীন বিখ্যাত আলেম তাকি উদ্দিন সুবকি (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি) ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন : 'ইবনে তাইমিয়া কোরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণের আড়ালে ইসলামী আকিদায় বেদআত ঢুকিয়ে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে। সে মুসলমানদের সামগ্রিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।' আলেম সমাজ ইবনে তাইমিয়ার লেখা বইগুলো পর্যালোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সত্তাসহ ইসলামের অন্যান্য বিধান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যগুলো একান্তই শিশুসুলভ। সেসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, ইসলামের গভীর এবং মূল্যবান তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।

নতুন নতুন আবিষ্কার যদি ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ না হয় তাহলে সেগুলোকে ইসলাম স্বাগত জানায়। অথচ ওয়াহাবিরা তাদের বিকৃত এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে বেদআত বলে মনে করে। তারা বলে, এগুলো মানুষকে

আল্লাহ্‌বিমুখ করে তোলে, তাই এগুলো ব্যবহার করা শির্‌ক। সৌদি আরবে মহিলাদের গাড়ি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ এ ধরনের আরো অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে আধুনিক টেকনোলজির কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও সৌদি আরবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা শির্‌ক হিসেবে গণ্য ছিল। এখনো ওয়াহাবি আলেমদের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার হারাম।

ওয়াহাবিরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানকে মুশরিক বলে ঘোষণা করে এবং তাদের জান-মাল, এমনকি নারীদেরকে নিজেদের জন্য হালাল বলে ঘোষণা করে। উগ্র এই মতবাদের সহিংসতার অসন্তোষজনক পরিণতি এখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিকৃত চিন্তাধারার অধিকারী ওয়াহাবি মতবাদের ধারক হচ্ছে এযুগের সহিংসতাকামী গোষ্ঠী তালেবান, আল-কায়েদা এবং এ জাতীয় আরো অনেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ইরাকসহ আরো অনেক দেশে পাশবিক হামলা চালিয়ে এরা বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে ভয়ঙ্কর চেহারায় তুলে ধরছে। ভয়াবহ এই সালাফি গোষ্ঠীগুলো অন্যান্য মুসলমানকে মুশরিক ভেবে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। এবারে উগ্র এই গোষ্ঠীগুলোর পেছনের ইতিহাসের দিকে নজর দেয়া যাক।

আফগানিস্তানের সন্ত্রাসী এবং ওয়াহাবি গোষ্ঠী তালেবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের যৌথ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে। তাদের নেতা হলো মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর। এই গোষ্ঠীটি ১৯৯৬ সালে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে এবং দেশের শাসনভার হাতে তুলে নেয়। তারা ওয়াহাবিদের কাঙ্ক্ষিত সরকারের নমুনা জনগণের সামনে তুলে ধরে। তারা ইসলামের নামে নৃশংস এবং মূর্খতাপূর্ণ আইন-কানুন চালু করে। সিনেমা থিয়েটার বন্ধ করে দেয়। জনগণকে বেত্রাঘাত করে জামাআতে নামায পড়তে বাধ্য করে এবং লম্বা দাড়ি রাখতেও বাধ্য করে। তালেবানরা মেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং নারীদেরকে ঘরের বাইরে কাজ করতে নিষেধ করে। তালেবানরা তাদের আকিদার বিরোধীদের হত্যা করে– সে সুন্নি হোক কিংবা শিয়া। এই উগ্র গোষ্ঠীটি মুসলমানদের ঐক্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পশ্চিমা মিডিয়াগুলোকে ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালাবার মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

এরকম আরো কিছু গোষ্ঠী আছে পাকিস্তানে। তালেবান এবং সৌদি আরবের সহযোগিতায় সৃষ্টি হয়েছে এই গোষ্ঠীটি। এরা ওয়াহাবিদের চেয়েও বেশি উগ্র। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করছে। মসজিদে নামাযরত অবস্থায়ও এই উগ্র গোষ্ঠীটি মুসল্লিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে।

আল-কায়েদা এরকম আরেকটি গোষ্ঠী। ওসামা বিন লাদেনের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীটির জন্ম হয়। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই গোষ্ঠীটির গোপন সম্পর্ক রয়েছে। তবুও ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পেছনে এই গোষ্ঠীটির হাত থাকার অজুহাতে আল-কায়েদার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আফগানিস্তানের ওপর মার্কিনীরা হামলা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে। ওয়াহাবি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি এখন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নামে ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, সিরিয়া, সোমালিয়াসহ আরো বহু মুসলিম দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকেই তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করছে।

এরাই ইসলামের নামে বিভিন্ন দেশে হাটে-বাজারে, লোকালয়ে বা জনসমাগম স্থলে, মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করছে, সিরিয়ায় সরকারি সেনাকে হত্যা করে কাঁচা কলিজা চিবিয়ে খেয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, সালেহিন এবং সকল মানুষকে ভালোবাসা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। ওয়াহাবিদের মতো উগ্র গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রমের ফলে সুযোগসন্ধানী ইসলামের শত্রুরা ভালোবাসা এবং প্রেমের ভিত্তিমূলে সৃষ্ট এই ঐশী ধর্মকে এখন বিকৃতভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। ওয়াহাবিদের কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে তারা ইসলাম এবং সব মুসলমানকে উগ্র এবং সন্ত্রাসী বলে প্রচার চালাচ্ছে।

আরব দেশগুলো ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও যেখানেই ওয়াহাবিরা উপযুক্ত মনে করেছে সেখানেই প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করা, আর্থিক এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া থেকেও তারা পিছিয়ে নেই। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেও সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতায় তালেবান নামের দলটি গড়ে তোলে। মিশরেও তারা সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে ওয়াহাবি মতবাদে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ওপর ভর করে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানরা ওয়াহাবিদের নীতি আদর্শে প্রভাবিত। ককেশাস এবং মধ্য-এশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের এলাকায় ওয়াহাবিদের অবস্থান শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার ব্যাপারে বহুবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির কারণেই এই অঞ্চলের দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ওয়াহাবি মতবাদ বিকাশ লাভ করতে পেরেছে। ভারতও একই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। সেখানে বহু ধর্ম ও মাযহাব রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী দেশ ভারত থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর সে দেশটিও ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার থেকে মুক্ত ছিল না। কারণ, ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক থাকায় ওয়াহাবিরা তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ওয়াহাবি মতবাদও প্রচার করে।

ওয়াহাবি ফেরকা গড়ে ওঠার শুরুর দিকে তাদের মূর্খতা আর গোঁড়ামির কারণে নতুন নতুন সকল আবিষ্কারকে বেদআত ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল। রাসূলের যুগের পদ্ধতিতে জীবনযাপন করতে হবে– এই অজুহাত দেখিয়ে তারা মানব সভ্যতার নতুন নতুন সকল উদ্ভাবনীর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। সালাফিরা অবশ্য এখন তাদের ফতোয়া বা কর্মপদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের মানে হলো তারা ইবনে তাইমিয়া এবং মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের বহু আকিদা বিশ্বাস থেকে সরে এসেছে। ওয়াহাবি আলেমরা দেখলেন যে, মানব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় এইসব প্রযুক্তির বিরুদ্ধে মূর্খের মতো ফতোয়া জারি করলে বর্তমান বিশ্বে তাঁদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে, যার ফলে ইতিহাসের আস্তা-কুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন শীঘ্রই। এ কারণেই তুলনামূলকভাবে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওয়াহাবি মুফতিরা তাঁদের ফতোয়ায় পরিবর্তন এনেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোবাইল, সাইকেল, গাড়ি, টেলিভিশন, ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবহারকে এক সময় ওয়াহাবি আলেমরা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন এগুলোর ব্যবহার হালাল বলে গণ্য করা হচ্ছে। আগের মতো এখন আর এসব প্রযুক্তির ব্যবহারকে শির্ক বলে মনে করা হচ্ছে না। এ থেকেই তাদের আকিদা অর্থাৎ ওয়াহাবি মতবাদ এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মাঝে ব্যাপক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। আর এই বৈপরীত্য থেকেই বোঝা যায়, ওয়াহাবি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এই মতবাদ এখন পতনোন্মুখ।

ওয়াহাবিরা কথায় কথায় সবকিছুকে বেদআত বলে প্রচার চালায়। তাদের কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের উদাহরণ দেয়া হলো যা সুন্নি সমাজে বেশ প্রভাব ফেলেছে। যেমন, প্রচলিত নিয়মে সুর করে মিলাদ পড়া, মিলাদে দাঁড়ানো বেদআত। শবে বরাত, শবে মেরাজ, বিশ্বনবী (সা.)-এর জন্মদিন বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন বেদআত, পীর-মুরিদ ও বাইয়াত পদ্ধতি বেদআত। চল্লিশা, মৃত্যু দিবস, কুলখানি, মৃতের জন্য কুরআন খতম, দোয়া ইউনুস খতম, মানুষ মারা গেলে কান্নাকাটি করা বেদআত ইত্যাদি। সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাজ ফতোয়া দিয়েছেন, রাসূলের মাযারে কান্নাকাটি করা যাবে না, মেয়েদের কণ্ঠস্বর বাইরের কোনো পুরুষ যেন শুনতে না পায়, যদি অফিসে নারী-পুরুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই একই নারীর দুধ খাওয়া দুধ ভাই-বোন হতে হবে অন্যথায় এক অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হারাম, হযরত আলী ও ইমাম হোসাইনের মাযারসহ বিশ্বের সব ওলির মাযার ভেঙে ফেলা উচিত, এমনকি রাসূলের মাযারও রাখা ঠিক নয়, আহলে কিতাবের অনুসারী হওয়ার কারণেই ইহুদি-খ্রিস্টানরা ভালো এবং শিয়ারা খারাপ, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে। এ ছাড়া, ছবি তোলা, টিভি দেখা হারাম, মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া পাপ ইত্যাদি।

মুফতি নাসের আল ওমর তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন : ...১০ই মুহররম বা আশুরার দিন উৎসব পালন করা এবং শিয়াদেরকে এ উৎসবে যোগ দিতে বাধ্য করা উচিত।'

এই মুফতি সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকার বিরোধী বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী বিদ্রোহীদের মনোরঞ্জনের জন্য ও তাদের জিহাদি চেতনা ধরে রাখার জন্য মুসলিম নারীদের 'যৌন জিহাদ'-এ অংশ নেয়ার জন্য সিরিয়ায় যাওয়ার ফতোয়া জারি করেছেন।

ডক্টর এসাম আল এমাদ ইয়েমেনের একজন নামকরা ওয়াহাবি মুফতি ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যয়নের পর বুঝতে পারলেন যে, ওয়াহাবি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ। সে কারণে ঐ মতবাদ ছেড়ে দিয়ে তিনি আহলে বাইতের ভক্ত হয়ে যান। তিনি বলেন : 'আমি সৌদি আরবের সাবেক মুফতি বিন বাযের কাছে লেখাপড়া করতাম। তবে সবসময় ভাবতাম যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যাবার পরও এখনো কেনো মানুষের মনে ইমাম আলী (আ.) কিংবা ইমাম হোসাইন (আ.) এবং অন্যান্য মহান ইমামের চিন্তাদর্শ জাগ্রত রয়েছে, কেনো এগুলো পুরনো হয়ে যাচ্ছে না। অন্যদিকে সৌদি আরবের শিক্ষামূলক সভা বা অধিবেশনগুলোতে ইমাম আলী (আ.) এবং ইমাম হোসাইন (আ.)-এর ব্যাপক সমালোচনা হতো। আবার আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করতাম

ইয়াযীদ ও তার পিতা মুয়াবিয়ার অত্যাচারগুলোর পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হতো। একবার এক সভায় দেখলাম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আলী (আ.)-এর সমালোচনা করা হচ্ছে আর তাঁর ব্যাপারে নোংরা শব্দ ও কথা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টা আমাকে একটু ভাবিয়ে তুললো। বাধ্য হয়ে আহলে বাইতের সদস্যদের নিয়ে পড়ালেখা শুরু করে দিলাম। পড়ালেখার একটা পর্যায়ে বুঝতে পারলাম ইমাম আলী (আ.)-এর সকল কথাই ছিল যৌক্তিক এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ওয়াহাবিদের সকল ব্যাখ্যা বা বক্তব্যই যুক্তিবহির্ভূত এবং অশালীন।'

মুফতি এসাম আলি ইয়াহিয়া আল-এমাদ বলেন : 'ওয়াহাবিদের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যাটি হলো সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড।' তাঁর মতে, অধিকাংশ ওয়াহাবিই মূর্খতার কারণে বিপথগামী। তারা কোরআনের বক্তব্যকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মার্কসিজ্‌ম, বাহায়ি, ইসরাইলি ও মার্কিনীদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি মুফতি বা আলেমদের লেখা কোনো বই নেই, তাঁদের যতো লেখা সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওয়াহাবিদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের চাইতে আরো বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে, এদের যাবতীয় কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বায়তুল মোকাদ্দাস দখলদার ইসরাইল ও মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে তারা কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলবিরোধী ইরান, সিরিয়া, হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো প্রতিরোধ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে ওয়াহাবিরা। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই ইসলামের নামে আল-কায়দা, তালেবান নামে বিভিন্ন উগ্র গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যাদের লক্ষ্য ইসলামের নামে ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এ ছাড়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারে পাশ্চাত্যের সরকারগুলো চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তারা আল-কায়দা ও তালেবানের মতো উগ্র গোষ্ঠীগুলোর হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ইসলামপন্থীদের কাজ বলে প্রচার চালাচ্ছে যার উদ্দেশ্য ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তিকামী চেহারাকে ধ্বংস করা এবং মানুষকে প্রকৃত ইসলাম বুঝতে না দেয়া।

পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোই এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, ইরান ও হিজবুল্লাহর মতো শিয়া গোষ্ঠী ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার কারণেও ওয়াহাবিরা শিয়াদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

যাহোক, আমি ইসলামের অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়কে সহজ ও সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা সবাই মুসলমান এবং আমাদের শত্রু অভিন্ন। সেই শত্রুকে চিহ্নিত করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের জন্য বর্তমানে যা করা প্রয়োজন তেমনি দুটি বিষয় নিয়ে নিচে আলোচনা করছি।

ক. ইসলামী বিপ্লব ও ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থা

মুমিন মুসলমানদের মূল লক্ষ্য হলো সকল মতবাদের বিপরীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব সাধন ও ইসলামী সমাজ নির্মাণ। ইসলামী বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম এমন এক বাস্তবতা যেখানে বাতিলের সাথে, অলসতার সাথে কিংবা দুনিয়াপূজার সাথে কোনো প্রকার আপোস চলে না। ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে মানুষের প্রতিষ্ঠিত সব মতবাদ বা সরকার ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহ্‌র মনোনীত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এ বিপ্লব মানেই আমূল পরিবর্তন। এ পরিবর্তন হতে হবে চিন্তা জগতে, দেশ পরিচালনায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিচার ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, প্রচার মাধ্যমে, প্রতিরক্ষা শক্তিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায়...।

এ ছাড়া, আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার বিপ্লবকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার অন্যতম শর্ত। বিশেষ করে আদর্শিক ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে বিরাট কোনো ব্যবধান থাকা উচিত নয়। এ এমন এক ইসলামী বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা যেখানে শয়তানি শক্তির অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগই থাকবে না। আর তাহলেই কেবল ইসলামী বিপ্লব চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এবং এ ধরনের ইসলামী বিপ্লবী সরকারের পক্ষেই কেবল গণমানুষের কল্যাণে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে এ বিপ্লবের একটি মাত্র উদাহরণ হচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান– যে দেশটি শত বাধাবিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ডিঙ্গিয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে টিকে আছে।

ইরানে ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবী আদর্শের প্রতি সম্মান রেখে রাজনীতি করা ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ইরানে আছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিশ্বে যে কেউ প্রেসিডেন্ট বা দেশের শীর্ষ কোনো পদে নির্বাচনে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে তার কিছু যোগ্যতা থাকতে হয়। প্রথমেই তাকে মুসলমান হতে হবে, ইসলামী বিপ্লব ও সরকারে তার অবদান থাকতে হবে, দেশ ও জাতির খেদমতে অতীত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো মামলা থাকতে পারবে না এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার প্রতি অনুগত থাকতে হবে। তবেই একজন ব্যক্তি ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। ফলে যিনিই নির্বাচিত হন না কেনো জনগণের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ইরানে যে ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সুফল অশেষ। এর অন্যতম হচ্ছে ভিন্নমত বা ভিন্ন আদর্শের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার নামে অনৈসলামিক কোনো দল বা সংগঠন গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। যদি এ ধরনের কোনো গ্রুপ গড়ে উঠত বা সুযোগ দেয়া হতো তাহলে ইসলামের শত্রুরা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এসব জনসমর্থনহীন অতি ক্ষুদ্র গ্রুপকে হাতিয়ার করে এবং তাদেরকে প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিপ্লব, ইসলামী সরকার ও জনকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা চালাতো, জনগণের মধ্যে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি করত। এভাবে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সব ক্ষেত্রেই অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতো। অনৈসলামিক এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সংগঠনের ওপর ভর করেই শত্রুরা সমস্ত ষড়যন্ত্র বা নীলনক্সা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতো।

কিন্তু সেই সুযোগ ইরানে নেই এবং বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি দিক দিয়ে ইরানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করলেও এখন পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়েছে। এটাই হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব ও ধর্মভিত্তিক জনগণের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা সাফল্য। বিপ্লব সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে আদর্শিক ঐক্য সৃষ্টি করা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক, আর এ ক্ষেত্রে শিয়া মাযহাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য শিয়া ধর্মীয় নেতাদের কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে, যে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

খ. প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলামী আন্দোলন

সুন্নিপ্রধান মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর চলমান ইসলামী আন্দোলন বা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে কখনো কখনো ক্ষমতায় আসা ইসলামপন্থী সরকারের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুগের পর যুগ ধরে সুন্নিপ্রধান মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলন চলে আসছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকারীরা অসংখ্য দল, মত ও সংগঠনে বিভক্ত। আলেমদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। তাঁরা ইসলামের বিপ্লবী চেতনা থেকে সরে এসে প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম করার কথা বলেন।

ইসলামের উন্নত শিক্ষার প্রভাবে সুন্নি সমাজের দীর্ঘ শত শত বছরের ইতিহাসে ইসলামের বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভৌগোলিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় সফলতার নজির রয়েছে। কিন্তু এসব সাফল্য তাঁরা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। এসব সফলতা একটি পর্যায়ে গিয়ে থেমে গেছে এবং পরবর্তী প্রজন্ম এর সুফল ভোগ করতে পারেনি। সুন্নিপ্রধান মুসলিম দেশগুলোতে রয়েছে দুটি প্রধান সমস্যা। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, ধর্মীয় দলগুলো ও নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, একক নেতৃত্বের অভাব ও জনবিচ্ছিন্নতা। আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ইসলাম কায়েমের নীতি।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন মতাদর্শের নামে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতি, লুটপাট, বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনৈসলামিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ঝগড়া-ঝাটি কিংবা সহিংসতায় দেশ ও জাতির ব্যাপক ক্ষতি হলেও ইসলামপন্থীদের তৎপরতা রোধে তারা আবার সবাই ঐক্যবদ্ধ। এ অবস্থায় ইসলামপন্থীরা যদি কখনো কোনো দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে রাস্তায় নামে তাহলে সন্ত্রাসী ও সহিংসকামী হিসেবে তুলে ধরে তাদের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো ইসলামপন্থী দলের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যদি ক্ষমতায় যেতেও পারে তাহলে কি অন্য অনৈসলামিক বা ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো বসে থাকবে? তারা ভেতরের শক্তি ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সহায়তায় যেভাবেই হোক ইসলামী সরকারকে ক্ষতি করার বা তাদের বদনাম করার কিংবা অকার্যকর সরকার হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেই।

এ অবস্থায় ইসলাম কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হলেও ঐ ইসলামী দলটি বেশি দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না এবং জোর করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের দুর্বল ইসলামী সরকার একদিকে যেমন দেশের ভেতরে ইসলামী সমাজ ও ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠায় পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নির্যাতিত জাতিগুলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে তারা শক্তিশালী কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তায় ইসলামপন্থী সরকারকে নানাভাবে হয়রানি করবে, নিষেধাজ্ঞা দেবে, সাহায্য বন্ধ করে দেবে, অভ্যুত্থান ঘটাবে এবং পরিশেষে পতন ঘটাবে।

কেউ নিজেদেরকে ইসলামপন্থী দাবি করলে তাদেরকে অবশ্যই সমস্ত অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে। কারণ, এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ অবস্থায় দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে যে চাপ আসবে তা মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব এবং ইসলামপন্থী সরকার কিছুতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এ অবস্থায় ইসলামপন্থী দলগুলো শুধু অন্য দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে যা খুবই অবমাননাকর ও লজ্জাজনক। কারণ, এর ফলে ইসলামপন্থীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকে না। এ পরিস্থিতি তাদের দীনতারই প্রমাণ।

এছাড়া, ধর্ম না থাকার কারণে অনৈসলামিক বা ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি-নৈতিকতাবোধ থাকে না, আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টিও থাকে না এবং এরা হয় চরম দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচার।

নির্বাচনে জিতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা কেউই আগের সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না। কারণ, তারা জানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে নিজেরা যেদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকবে সেদিন তাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ অবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাউকেই অবস্থান নিতে দেখা যায় না এবং ক্ষমতা দখল নিয়ে তারা হানাহানিতে ব্যস্ত থাকে। এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদরা অবৈধ অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে অথচ ধর্মের ধারে কাছেও তারা নেই এবং যতটুকু ধর্মের কথা বলে বা নামায,

রোযা, হজ করে তা সম্পূর্ণ লোকদেখানো মাত্র। আর এরাই হচ্ছে আসল ধর্ম ব্যবসায়ী। এরা নিজ স্বার্থে দেশ ও জনস্বার্থবিরোধী কাজ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কোনো কোনো নেতা সৎ চরিত্রের হলেও অসৎ চরিত্রের রাজনীতিবিদদের স্রোতের তোড়ে তারা ভেসে যান। ইসলামপন্থীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করার কারণে তাদের মধ্যে অনেক সততা কাজ করে। এ অবস্থায় কোনো ইসলামী দল ক্ষমতায় থাকলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের সুযোগ সীমিত হয়ে আসে এবং যেভাবেই হোক নিজেদের স্বার্থে ইসলামী সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করে। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে, মিশর পরিস্থিতি।

এত দীর্ঘ বছর ধরে সংগ্রাম ও ত্যাগতিতিক্ষার পর মিশরে ইসলামপন্থীরা সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও তারা প্রচলিত বহু আদর্শিক বা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে যেতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ঘটেছে। মিশরে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় গেলেও স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো অবস্থায় তারা ছিল না। প্রচলিত বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ মিশর। ইসলামপন্থীরা মিশরে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পেলেও সেক্যুলারপন্থী ও পাশ্চাত্যঘেঁষা বিরোধী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছে। বিদেশীরা মিশরের অনৈসলামিক দলগুলোর সহায়তায় এমনভাবে ইখওয়ানের নেতৃত্বে ইসলামপন্থী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে, শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় বেশিদিন থাকতে পারেনি। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ বলেছিলেন : 'মিশরের ঘটনায় ইসলামের নামে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ভ্রান্ত রাজনীতির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়েছে।' প্রেসিডেন্ট আসাদের এ বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্য থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুন্নিপ্রধান সব মুসলিম দেশের একই অবস্থা। এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইরানের মতো ইসলামী বিপ্লবী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প মুসলিম বিশ্বের সামনে নেই। শত শত বছর ধরে ধরে চলে আসা সুন্নি মুসলিম বিশ্বের এ দুরবস্থার পেছনে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণ রয়েছে।